অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ জলিলের লিখিত কিতাব সমূহ ঃ

- ❑ বোখারী শরীফ বাংলা সংকলন
- ❑ রাহমাতুল্লীল আলামীন
- ❑ নূর-নবী (দঃ)
- ❑ কারামাতে গাউছুল আযম
- ❑ আহ্‌কামুল মাযার
- ❑ শিয়া পরিচিতি
- ❑ ইস্‌লাহে বেহেশতী জেওর
- ❑ ঈদে মিলাদুন্নবী
- ❑ গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস
- ❑ মিলাদ ও কিয়ামের বিধান
- ❑ প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাছায়েল শিক্ষা
- ❑ স্মরণীকা ৯৭, ৯৮ ও ৯৯ সংখ্যা

প্রাপ্তি স্থান

১। গাউছুল আযম জামে মসজিদ
এ/৯, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

২। গাউছিয়া লাইব্রেরী
কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৩। ১০/২৯, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭

৪। কুতুবিয়া দরবার শরীফ
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সফরনামা - আজমীর

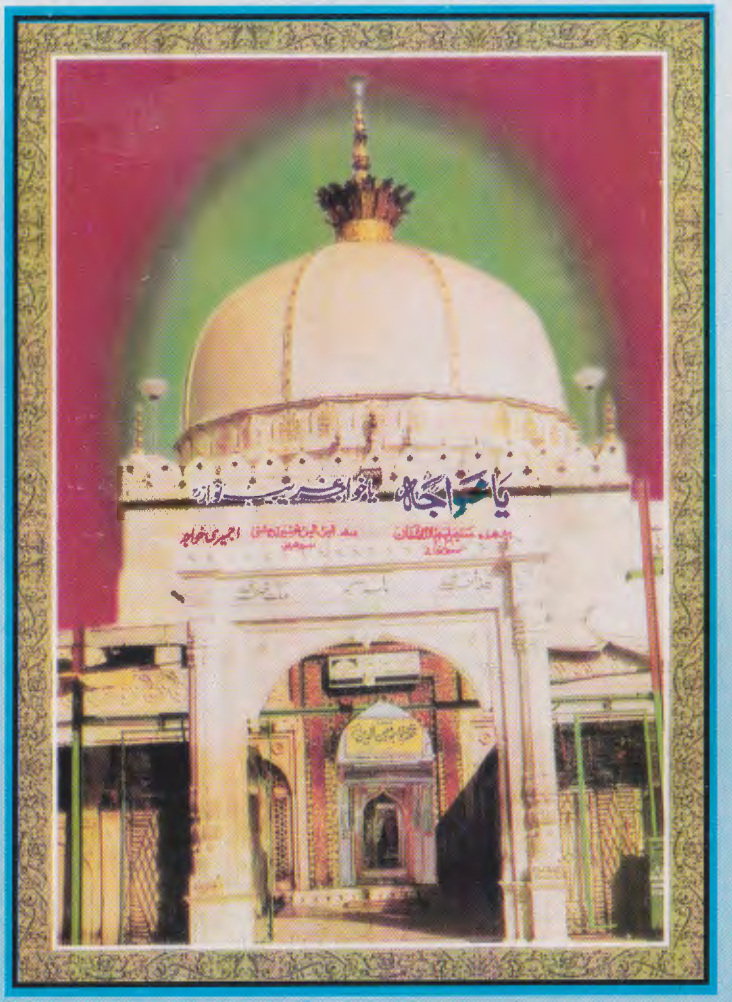

অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা এম এ জলিল
(এমএম, এমএ, বিসিএস)

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ জলিলের লিখিত কিতাব সমূহ ঃ

- ❑ বোখারী শরীফ বাংলা সংকলন
- ❑ রাহমাতুল্লীল আলামীন
- ❑ নূর-নবী (দঃ)
- ❑ কারামাতে গাউছুল আযম
- ❑ আহ্‌কামুল মাযার
- ❑ শিয়া পরিচিতি
- ❑ ইস্‌লাহে বেহেশতী জেওর
- ❑ ঈদে মিলাদুন্নবী
- ❑ গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস
- ❑ মিলাদ ও কিয়ামের বিধান
- ❑ প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাছায়েল শিক্ষা
- ❑ স্মরণীকা ৯৭, ৯৮ ও ৯৯ সংখ্যা

প্রাপ্তি স্থান

১। গাউছুল আযম জামে মসজিদ
এ/৯, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

২। গাউছিয়া লাইব্রেরী
কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৩। ১০/২৯, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭

৪। কুতুবিয়া দরবার শরীফ
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সফরনামা - আজমীর

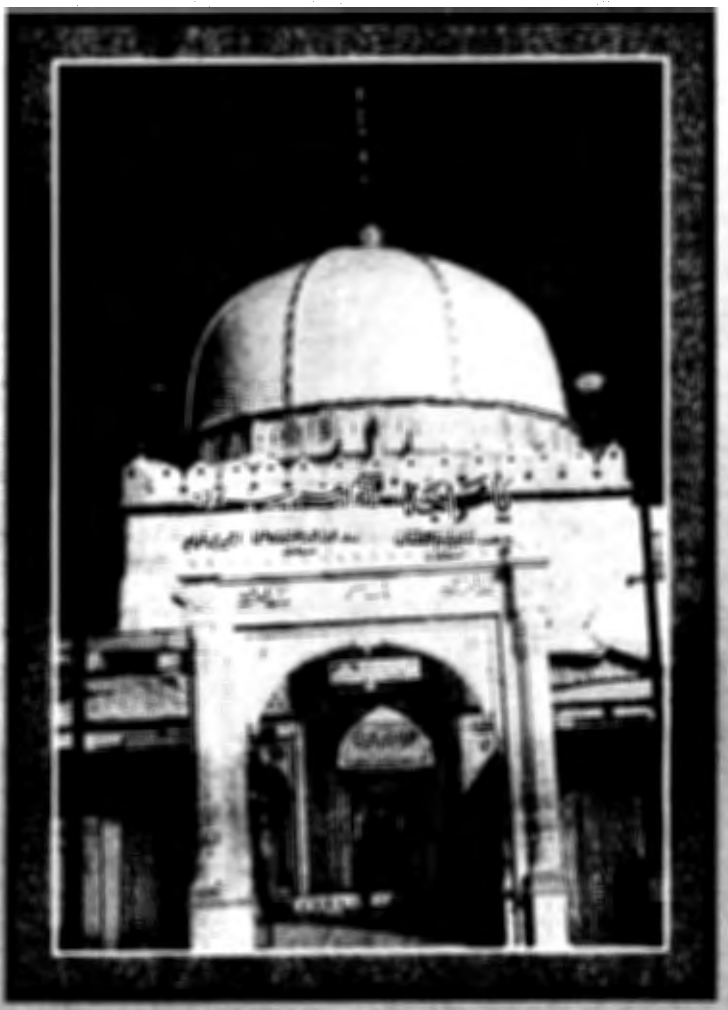

অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা এম এ জলিল
(এমএম, এমএ, বিসিএস)

সফরনামা — আজমীর
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা এম এ জলিল (এমএম, এমএ, বিসিএস)
১০/২৯, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭

সাবেক ডাইরেক্টর ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
মহাসচিব ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত
অধ্যক্ষ ঃ কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ
জমাদিউল আউয়াল ১৪২০ হিজরী
আগষ্ট ১৯৯৯ইং

প্রকাশক ঃ
মোঃ জামাল মিয়া
হোটেল আকবর
সায়দাবাদ বাস টারমিনাল, ঢাকা।
ফোন ঃ ২৩৫৩০৩

হাদিয়া ঃ ৫০.০০

মুদ্রণে ঃ
এইচ কে প্রিন্টার্স
১৩১, ডি আই টি এক্সটেনশন রোড
ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৪০৭৮০৪

সফর নামা— আজমীর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম

সফর করা কি?

সৎ উদ্দেশ্যে যে কোন সফর করা ইসলামে বৈধ। আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন মজিদে এরশাদ করেছেন-

"কুল ছিরু ফিল্ আরদি"

"হে প্রিয় রাসুল (দঃ)! আপনি ঘোষণা দিয়ে বলুন- তোমরা খোদার জমিনে -এই পৃথিবীতে সফর করো- ভ্রমণ করো।"

পাক কালামে অনেক প্রকার ভ্রমণ বা সফরের কথা উল্লেখ আছে। যেমন ঃ

১। হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা (সুরা নিসা ৫ম পারা)।

২। ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফর করা (সুরা কুরাইশ)।

৩। পীর মাশায়েখগণের অনুসন্ধান ও মুলাকাতের উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক সফর করা (সুরা কাহাফ- হযরত মুসা (আঃ) এর সফর প্রসঙ্গে)।

৪। প্রিয়জনের অনুসন্ধ্যানে সফর করা (সুরা ইউসুফ)।

৫। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সফর করা (হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জামা নিয়ে মিশর থেকে কেনান সফর)।

৬। আপন জন ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফর করা (সুরা ইউসুফ)।

৭। উপার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশ সফর করা (সুরা ইউসুফ)।

৮। কাফেরদের নিকট তাবলীগে দ্বীনের উদ্দেশ্যে সফর করা (হযরত মুসা (আঃ)-এর মিশর সফর)

৯। বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সফর করা (সুরা তৌবা- ফালাওলা নাফারা....)

১০। নাফরমানির পরিণতি দেখা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গজব প্রাপ্ত এলাকার সফর করা (কুল ছিরু ফিল আরদে..... কোরআন)।

উল্লেখ্য যে, খোদার অবাধ্য ও নাফরমানদের গজবপ্রাপ্ত এলাকা সফর করার জন্য কোরআনে নির্দেশ রয়েছে। কারণ হিসাবে আল্লাহ পাক স্বয়ং উল্লেখ করেছেন যে, নিজেরা গিয়ে দেখে এসো- অস্বীকারকারীদের পরিণতি কি

হয়েছিল। যেখানে নাফরমানদের এলাকা সফর করার অনুমতি রয়েছে- সেখানে খোদার ফরমাবরদার অলী- আল্লাহদের মাযার যিয়ারত করা বতরিকে আওলা (উত্তমভাবে) প্রমাণিত হলো। আল্লাহর অলীগণ হচ্ছেন বাতেনী চিকিৎসক। এক একজনের দরবারে এক এক রকম চিকিৎসা ও ফয়েজ- বরকত রয়েছে। তাঁদের মাযারে গমন করলে শানে এলাহী দৃষ্টি গোচর হয়। তাঁরা চোখের অন্তরালে থেকেও দুনিয়ায় রাজত্ব চালাচ্ছেন। তাঁদের দরবারে গেলে ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের মাযারে শীঘ্র দোয়া কবুল হয়। যেমন- হযরত মরিয়মের হুজরাতে সন্তানের জন্য হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দোয়া তৎক্ষণাৎ কবুল হয়েছিল। সুরা আলে ইমরানে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। এ প্রসঙ্গে ফতোয়া শামী প্রথম খন্ড যিয়ারত অধ্যায়ের কিয়দাংশের অনুবাদ নিম্নে দেখুন-

"আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ ও যিয়ারতকারীদের উপকার সাধনের ক্ষেত্রে আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে এক এক জনের এক এক রকম ক্ষমতা রয়েছে। মারেফাত ও গুপ্ত রহস্যের ক্ষেত্রে তাঁরা নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ীই বিভিন্ন প্রকারের উপকার সাধন করে থাকেন।"(শামী যিয়ারত অধ্যায়)

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারতের উপকারিতা প্রসঙ্গে অনেক হাদীস, চাক্ষুস প্রমাণ ও উলামাগণের মতামত বিদ্যমান রয়েছে। যেমনঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

"আমি ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত কারণে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম- কিন্তু মদিনা জিন্দেগীতে এসে ওহীর মাধ্যমে যিয়ারত করার অনুমতি লাভ করেছি। অতএব, এখন থেকে তোমরা কবরসমূহ যিয়ারত করতে থাকো" (মিশকাত- যিয়ারত অধ্যায়)

অতএব, কবর যিয়ারত করা হাদীসের দ্বারাই প্রমাণিত। সাধারণ কবর যিয়ারত করার অনুমতি যেখানে দেওয়া হয়েছে- সেখানে বিশেষ বিশেষ মাযার যিয়ারত করার ক্ষেত্রে নিষেধ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকতে পারেনা। আল্লামা তকিউদ্দীন সুবকী (মিশর) নবী করিম (দঃ)-এর রওযা মোবারক যিয়ারতের ব্যাপারে প্রায় ত্রিশ খানা হাদীস তাঁর অমর গ্রন্থ "সিফাউস সিকাম"-এ বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু হতভাগা ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইয়েম, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী ও তাদের অনুসারী এদেশীয় বাতিল পন্থীরা বলে থাকে- কবর বা মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা নাকি হারাম। তাদের একটি মাত্র মনগড়া দলীল হলো- নবী করিম (দঃ)-এর একটি হাদীসের অপব্যাখ্যা।

বোখারী শরীফের উক্ত হাদীস খানায় মসজিদে মসজিদে সফর করার ক্ষেত্রে হুজুর (দঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নবী করিম (দঃ) তিন মসজিদ ছাড়া অন্যান্য

মসজিদের যিয়ারত নিষেধ করেছেন। ওহাবীরা উক্ত হাদীসখানা আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারতের ক্ষেত্রে অপব্যবহার করে বলে থাকে- মাযারের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। তাদের মতে, যেখানে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদের সফরকে হারাম করা হয়েছে- সেখানে মাযারের কি মূল্য আছে ? (দেখুন ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) ইবনে তাইমিয়ার অনেক পূর্বেই হাদীসখানার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি বলেন- উক্ত হাদীস খানায় নিষেধাজ্ঞা শুধু মসজিদের সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য- মাযারের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, উক্ত হাদীসে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গা সফর করা হারাম হওয়ার অর্থ- আরবী গ্রামার অনুযায়ী- অন্য মসজিদের সফর করা। ব্যবসা বাণিজ্য, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য বিদেশ সফর করার বৈধতা কোরআনের দশটি আয়াত দ্বারা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ আমার কোন হাজত দেখা দিলে এবং তার সমাধান না পেলে আমি ফিলিস্তিন থেকে বাগদাদে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাযার যিয়ারতের জন্য গমন করতাম এবং সেখানে গিয়ে দু'রাকআত নফল নামায আদায় করে ইমাম সাহেবের মাযার যিয়ারত করে তাঁর উছিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার সাথে সাথে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।" (মোকদ্দমা শামী- ইমাম আবু হানিফা প্রসঙ্গ)

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারত সংক্রান্ত আমার (জলীল) লিখিত 'আহকামুল মাযার' গ্রন্থে বিস্তারিত দলীল ও উপকারিতা লিখিত আছে।

সংক্ষেপ কথা হলো- সফর করার উদ্দেশ্যের উপরই সফরের ভাল মন্দ নির্ভরশীল। উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তাহলে সফর করাও বৈধ- জায়েয। আর উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়, তাহলে সফর করাও অবৈধ ও নাজায়েয। মুফতী আহমদ ইয়ার খান (রহঃ) তাঁর অমরগ্রন্থ জা-আল হক্ব-এ এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালার উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ

১। হারাম কাজের উদ্দেশ্যে সফর করাও হারাম। যেমন- চুরি ও যিনা।

২। হালাল কাজের উদ্দেশ্যে সফর করাও হালাল। যেমন- হজ্ব ও যিয়ারত- ইত্যাদি।

আবার উক্ত হালাল কাজটি যদি ফরজ হয়, তাহলে তার জন্য সফর করাও ফরজ। যেমন- হজ্জ। আর উক্ত কাজটি যদি ওয়াজিব হয়, তবে তার জন্য সফর করাও ওয়াজিব। যেমন- মান্নতের হজ্জ। উক্ত কাজটি যদি সুন্নাত হয়, তবে তার জন্য সফর করাও সুন্নাত। যেমন - যিয়ারত। উক্ত কাজটি যদি মুবাহ বা বৈধ হয়, তবে তার জন্য সফর করাও মুবাহ বা বৈধ। যেমন- ব্যবসা, চিকিৎসা, বন্ধু-বান্ধবের সাথে বিদেশে গিয়ে সাক্ষাৎ করা- ইত্যাদি। আরবীতে ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি সূত্র আছেঃ "মুকাদ্দাতুল হারামে হারামুন ওয়া মুকাদ্দামাতুল ওয়াজিবে ওয়াজিবুন।" অর্থাৎ হারাম কাজের আনুসাঙ্গিক ও পূর্ব প্রস্তুতিমূলক

কাজও হারাম এবং ওয়াজিব কাজের আনুসাঙ্গিক ও পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজও ওয়াজিব। এই সূত্র অনুযায়ী যেহেতু জিয়ারত সুন্নাত- সুতরাং এতদ্দোশ্যে সফর করাও সুন্নাত। এই সূত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উক্ত দীর্ঘ আলোচনায় প্রমাণিত হলো- আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারত করা ও তার জন্য সফর করা উভয়টিই সুন্নাত। যারা হারাম বলে- তারাই বরং হারামী ও বেদ্বীন।

আল্লামা শামী ও ইমাম গাজ্জালীর বর্ণনা অনুযায়ী আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারতে অনেক উপকারিতা আছে এবং মাযারস্থ ওলীগণ যিয়ারতকারীদের অনেক উপকার করে থাকেন।

আমাদের আজমীর সফর

উপরোক্ত পটভূমিকার আলোকে খাজা গরীব নওয়াজ রহমতুল্লাহে আলাইহের ৭৮৬তম বার্ষিক উরস মোবারক (বিসমিল্লাহ উরস) উপলক্ষে বাংলাদেশের অসংখ্য ভক্তদের ন্যায় আমরাও ২১ জনের একটি কাফেলা নিয়ে ১৯৯৮ সালের ১০ই অক্টোবর শনিবার দিবাগত রাত্রে আজমীর শরীফের উদ্দেশ্যে বেনাপোল হয়ে রওয়ানা হয়ে যাই। আমাদের শেষ গন্তব্য আজমীর শরীফ হলেও পথে আরও অনেক পবিত্র মাযার ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করি। আমাদের ভ্রমণ পথ ছিলো ১৭ দিনে প্রায় ছয় হাজার কিলোমিটার এবং দর্শনীয় স্থান ও যিয়ারতগাহ্ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। **কলিকাতায় ঃ** হযরত মাওলা আলীর (রহঃ) মাযার, হযরত ওবায়দুল্লাহ বাগদাদীর (রহঃ) মাযার ও হযরত ফকির হিন্দ (রহঃ)-এর মাযার। এছাড়াও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ছিল নাখোদা মসজিদ, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা, হাওড়া ব্রীজ, পাতালপুরী রেলপথ ও বিরলা তারামন্ডল।

২। **দিল্লী ঃ** হযরত আবুবকর তুসী (রহঃ)-এর খলিফা হযরত রহিমুদ্দীন ওরফে মটকে শাহ (রঃ)-এর মাযার, হযরত নাসির উদ্দিন মাহমুদ রৌশন চেরাগে দেহলীর (রহঃ) মাযার, হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) ও হযরত আমির খসরু (রহঃ)-এর মাযার, হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহঃ) ও হযরত হামিদুদ্দীন নাগুরী (রহঃ)-এর মাযার, লালকিল্লা, জামে মসজিদ, ফতেহপুরী মসজিদ ইত্যাদি।

৩। **পানি পথ ঃ** হযরত শরফুদ্দীন বু-আলী কলন্দর শাহ (রহঃ) ও হযরত মুবারক শাহ (রহঃ)-এর মাযার, খাজা সামছুদ্দীন তুর্কী সাবেরী (রহঃ) ও হযরত জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়ার (রহঃ)-এর মাযার, কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী ও মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালীর কবরদ্বয় দর্শন ও অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার যিয়ারত।

৪। **সেকেন্দ্রা ঃ** দ্বীনে এলাহীর প্রবর্তক সম্রাট আকবরের সমাধি ও হনুমানের খামার পরিদর্শন।

৫। **আগ্রা ঃ** সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগমের অমর স্মৃতি তাজমহল পরিদর্শন ও কবর যিয়ারত, তথাকার ঐতিহাসিক মসজিদ সমূহ পরিদর্শন।

৬। **ফতেহপুর সিক্রি ঃ** হযরত সেলিম চিশতী (রহঃ)-এর মাযার যিয়ারত।

৭। **জয়পুর ঃ** দর্শনীয় রাজ প্রাসাদ সমূহ পরিদর্শন।

৮। **আজমীর শরীফ ঃ** হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) ও তাড়াগড় পাহাড়ে ৩০০ শহীদের মাযার এবং সারওয়ার শরীফে খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ)-এর বড় সাহেবজাদা হযরত খাজা ফখরুদ্দীন চিশতী (রহঃ)-এর মাযার যিয়ারত, আনা সাগর ও হযরত বখতিয়ার কাকী (রহঃ)-এর চিল্লা, সদা বাহার পাহাড় ও রাজা পৃথ্বিরাজের ফিলখানা দর্শন- ইত্যাদি।

৯। **ইউ,পি'র বেরেলী শরীফ ঃ** ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রহঃ)-এর মাযার, মাওলানা হামেদ রেজা খান (রহঃ), মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরত মাওলানা মোস্তফা রেজা খান (রহঃ), মাওলানা ইবরাহীম রেজা ও রায়হান রেজা খান (রহঃ)-এর মাযার সমূহ যিয়ারত।

১০। **দেশে প্রত্যাবর্তন ঃ** ২৭শে অক্টোবর ১৯৯৮ইং।

সফর সঙ্গীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল
সাবেক ডাইরেক্টর ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মহাসচিব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, খতীব শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ।

আলহাজ্জ মাওঃ সেকান্দর হোসাইন
আল-কাদেরী
শিক্ষা সচিব, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, ঢাকা।

মাওলানা মাসউদ হোসাইন
খতীব, ছায়াবিথি জামে মসজিদ বাসাবো, ঢাকা।

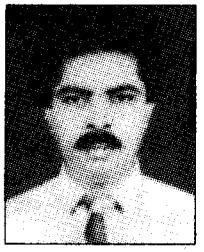

মোঃ আবুল হাশেম
সাংবাদিক, ব্যাংকার, এইচ কে প্রিন্টার্স ও উপশম হসপিটাল'র পরিচালক

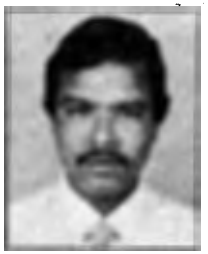

মোঃ গোলাম কিবরিয়া
সিনিয়র ডিজাইনার
এইচ কে প্রিন্টার্স ও
উপশম হসপিটাল'র পরিচালক

রাহাত কামাল কাদেরী
(বিপ্লব)
বাসাবো, ঢাকা

মোঃ জামাল
মালিক, হোটেল আকবর
সায়েদাবাদ, ঢাকা।

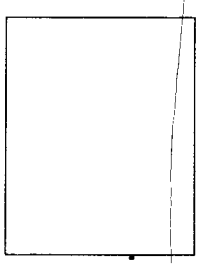

মিসেস জামাল

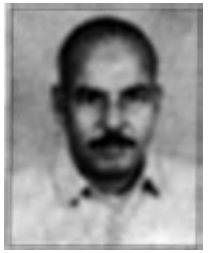

ডাঃ মোহাম্মদ আলী মিয়া
সায়লা ফার্মেসী
৮৮, সায়দাবাদ, ঢাকা।

এ কে এম হায়দার উজ-জামান
সাব রেজিষ্ট্রার, রায়পুর,
নরসিংদী

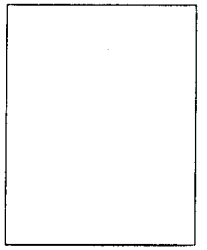

মিসেস হায়দার উজ-জামান

মাওলানা আব্দুল কাদের
কাদেরীয়া মঞ্জিল
৭৫৮, দঃ মাডা, ঢাকা-১২১৪।

সফর সঙ্গীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মোঃ আব্দুল কাদের খান
খান হাউজ
১০৭, মধ্য বাসাবো,ঢাকা-১২১৪।

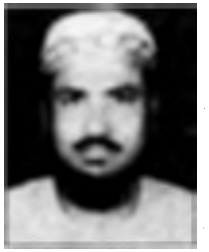

আব্দুল মালেক
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

ইকবাল হোসাইন
ন্যাশনাল টেলিকম সর্ভিস
২৭/২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মোঃ ফজলুর রহমান
২০২ উত্তর শাহজাহানপুর
ঢাকা।

এ এন এম সাবিক (মাসুম)
১৮ গ্রীন রোড, ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৫

মোঃ আনোয়ার হোসাইন
এস.এ.এস সুপরিনটেনডেন্ট
অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

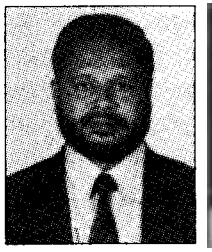

মোঃ আবদুল মতিন
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।

হাজী নূর মোহাম্মদ
আজিজ মহল্লা,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মোহাম্মদ আলী লালু
শাহজাহানপুর, ঢাকা।

কাজী আবদুল কুদ্দুস
ইউএমসি জুটমিল
নরসিংদী।

আব্দুস সুকুর
ইউএমসি জুটমিল
নরসিংদী।

সফরের প্রস্তুতি পর্ব ও রওয়ানা

আজমীর শরীফের দু'হাজার খাদেমের অন্যতম খাদেম জনাব ইকবাল উদ্দীন চিশতী ১৯৯৮ইং সালের মধ্যভাগে বাংলাদেশ সফরে এসে উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদে এক শুক্রবার জুমা আদায় করেন এবং অধমকে (এম এ জলীল) খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ)-এর মাযার যিয়ারতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৯৯৭ইং সালে ১১ জন সহ আজমীর শরীফের যিয়ারতকালে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ সুবাদেই এই পরিচিতি। তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে ঐ জুমাতেই আজমীর শরীফ যিয়ারতের ঘোষণা করে দেই। পরবর্তীতে রওনা দেয়ার তারিখ নির্ধারণ করি ১০ই অক্টোবর। ধীর ধীরে আগ্রহী ব্যক্তিরা পাসপোর্টে ডলার এনডোর্স করে ভিসার জন্য জমা দিতে থাকেন। সর্বমোট ২১ জন যাত্রীর ভিসার কাজ সমাধা করে বিদেশ ভ্রমণ ট্যাক্স ২৫০/- হারে সোনালী ব্যাংকে জমা দিয়ে আজমীর শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করি। ৪ জনকে ৭ই অক্টোবর কলকাতায় অগ্রীম পাঠিয়ে দেই- ২১ জনের জন্য কলকাতা- দিল্লী ট্রেনের রিজারভেশন টিকিট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। বাকী ১৭ জন রওয়ানা দেই ১০ই অক্টোবর শনিবার রাত ৯টার বাসে বেনাপোলের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য যে, এবার আজমীর শরীফের উরস ছিল ৭৮৬তম উরস- যা বিসমিল্লাহ শরীফেরও সংখ্যা। সুতরাং সারা ভারত ও বাংলাদেশের মানুষ উক্ত উরস মোবারককে বিসমিল্লাহ উরস শরীফ নামে অভিহিত করে তাতে যোগদানের জন্য পাগল পারা হয়ে উঠেন। আর সে কারণে একমাস পূর্বেই কলকাতা-দিল্লী ট্রেনের রিজারভেশন টিকিট প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে। অগ্রগামী দলটি আমাদের জন্য কলকাতা ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের কুলিন লেইনে আমরীন লজ নামে একটি হোটেলে ঠাসাঠাসি করে থাকার ব্যবস্থা করতে পারলেও ট্রেনের অগ্রীম টিকিট সংগ্রহ করতে পারেন নি। আমরা কলকাতা ১১ অক্টোবর পৌঁছে অনেক চেষ্টা তদবীর করে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে ১৪ই অক্টোবর তারিখে দিল্লী লাল কিল্লা নামক লোকাল ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ করি।

বেনাপোল-হরিদাসপুর চেক পোষ্ট

আমাদের ভিসা ফরমে 'বাই রোড বেনাপোল- হরিদাসপুর চেক পোষ্ট' উল্লেখ করায় এ পথেই গমন ও আগমন বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। ১০ই অক্টোবর রাত ৯টায় সোহাগ পরিবহনে চড়ে সকাল ৫-৩০ মিনিটে বেনাপোল পৌঁছি। আমাদের সফরসঙ্গী জনাব জামাল সাহেব এবং রাহাত কামাল কাদেরী (বিপ্লব) দুজনে আজমীর শরীফের জন্য দুখানা মূল্যবান গেলাফ তৈরী করে সাথে নিয়ে যান। বেনাপোল পৌঁছে ফজর নামাজ পড়ে কোহিনূর এজেন্সীর মালিক অলিউল্লাহর মাধ্যমে বেনাপোলের ইমিগ্রেশন ফরম ও হেলথ সার্টিফিকেট পূরণ করে ঐগুলো সহ ইমিগ্রেশন অফিসে পাসপোর্ট জমা দেয়া হয়। নির্ধারিত

বখশিষ(?) দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাসপোর্ট ফেরত নিয়ে কাষ্টমস অফিসে গিয়ে পুনরায় পাসপোর্ট জমা দেই। কোহিনুর এজেন্সীর সহায়তায় অতি সহজেই কাষ্টম অফিস থেকে পাসপোর্ট ফেরত নিয়ে বর্ডারে গমন করি। বাংলাদেশী বর্ডার পুলিশ পুনরায় পাসপোর্ট দেখে বর্ডার অতিক্রম করার অনুমতি প্রদান করে।

ভারতীয় হরিদাসপুর চেকপোষ্ট

১০ গজ দূরে ভারতীয় বর্ডারে পুলিশকে পাসপোর্ট প্রদর্শন করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর পর ভারতীয় কাষ্টমস অফিসে গমন করার অনুমতি পাই। তথায় সকলের পাসপোর্ট জমা দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। একে একে সকলের ডাক পড়ে। কাষ্টম অফিসার ডলার এনডোর্সমেন্টের কাগজপত্র ও পাসপোর্ট চেক করে তাদের দাবীকৃত ফি নিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে। ওখানে গিয়ে পুনরায় ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করে পাসপোর্ট সহ জমা দেই। ওখানেও মাথা পিছু ৫০ টাকা দিয়ে ছাড়া পাই। ইমিগ্রেশন অফিসের শেষ রুমে পাসপোর্ট প্রদর্শন করে রেজিষ্টারে পাসপোর্ট নম্বর লিখে ১০/- হারে বখশিষ দিয়ে শেষ বারের মত ছাড়া পাই। বাংলাদেশী ও ভারতীয় উভয় চেক পোষ্টের এই বেদনাদায়ক হয়রানী প্রত্যেক যাত্রীকেই ভোগ করতে হয়। তবে সাংবাদিক হলে নাকি কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। অভিযোগ করেও কোন কাজ হয়না। কেননা- সেখানে পোষ্টিং নাকি বেচা কেনা হয়। তাই পুষিয়ে নিতে হয়। সকাল ৯-৩০ মিনিটে ঝামেলামুক্ত হয়ে ১৭ জনের ডলার একচেঞ্জ করতে প্রায় ১১টা বেজে যায়। হরিদাসপুর থেকে কলকাতায় টেক্সীতে যেতে মাথা পিছু ১৫০/- রূপী লাগে। তিনটি টেক্সী ভাড়া করে ১৭জন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হই। কিন্তু ড্রাইভারগুলো খুবই প্রতারক। কিছুদূর গিয়ে তারা অন্য টেক্সীর কাছে যাত্রী বিক্রি করে দেয়। যাক, বনগা শহরের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের নাকের ডগায় সন্ত্রাসী মার্কা হিন্দু যুবকরা একাধিক জায়গায় টেক্সী থামিয়ে পুজার নামে চাঁদা আদায় করে। না দিলে দুর্ব্যবহার করে এবং গাড়ী আটকিয়ে রাখে। এভাবে বারাসত (২৪ পরগনা) পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু যুবকরা এই চাঁদাবাজী করে থাকে। মনে হয়- তারা বাংলাদেশী হিন্দু ছিল। দেশ বিভাগের পর উক্ত এলাকায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেয় এবং বাঙালী মুসলমান দেখলেই আক্রোশে এই চাঁদাবাজী করে। বারাসাতের পর চাঁদাবাজী নেই বললেই চলে। বাংলাদেশী চাঁদাবাজরা যাত্রীদের কাকুতি মিনতি কিছুটা হলেও শুনে- কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু চাঁদাবাজরা কোন কাকুতি মিনতিই শুনেনা বরং ভীম গর্জনে তেড়ে আসে। মুসলমান যাত্রীরা স্থলপথে কলকাতা যেতে নিজেকে বড়ই অসহায় মনে করে। চিকিৎসার্থে মূমূর্ষ রোগীরাও এদের চাঁদাবাজী থেকে রেহাই পায় না। এর অবসান কবে হবে- তা ভারতীয় দূতাবাসই জানেন।

কলকাতায় উপস্থিতি

তিন ঘন্টায় ৯৯ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে ১১ই অক্টোবর বিকাল ৩.০০ টায় কলকাতায় উপস্থিত হই এবং আমরীন লজ হোটেলে গিয়ে উঠি। আমাদের

অগ্রগামী দলের ৪ জন প্রাণান্ত চেষ্টা করেও দিল্লী মেইল ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ইত্যবসরে হোটেলের মালিক চেষ্টা করে দিল্লীর পরিবর্তে জয়পুর ট্রেনের টিকিট দেয়ার প্রস্তাব দেয়। অবশেষে বেঙ্গল ট্রাভেলসকে ধরে ১৪ই অক্টোবর দিল্লীর লোকাল ট্রেনের টিকিট দ্বিগুণ টাকায় সংগ্রহ করি এবং ২৪শে অক্টোবর দিল্লী-কলকাতার লোকাল ট্রেনের অগ্রীম ফিরতি টিকিটও নিয়ে নেই। রাজধানী, কাল্‌কা ওপূর্বা এই তিনটি মেইল ট্রেনের কোনটির টিকিটই পাইনি।

এতক্ষণ ধরে এত লম্বা ফিরিস্তি দেয়ার একমাত্র কারণ হলো- যারা বাঁই রোডে কলকাতা ও দিল্লী যাতায়াত করবেন- তারা যেন সব কিছু অবগত হয়েই সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। যাক- ১১ থেকে ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলকাতা অবস্থানকালে কিছু মাযার ও দর্শনীয় স্থানে গমন করি। ১২ তারিখে ৪টি টেক্সী মিটারে ভাড়া করে প্রথমে যাই তালতলায় অবস্থিত পুরানা কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায়। গিয়ে দেখি- গেইটে লেখা আছে- কলকাতা সরকারী আলিয়া কলেজ। ভিতরে নীচ তলায় স্কুল এবং দোতলায় মাদ্রাসা। বেলা তখন ১০-৩০ মিনিট। কিন্তু মাদ্রাসা খোলা থাকলেও প্রিন্সিপ্যাল, শিক্ষক বা কোন ছাত্রের দর্শন পাইনি। দারোয়ান এর সদুত্তর দিতে পারেনি। নোটীশ বোর্ডে দেখলাম- কামিল ক্লাসের সিলেবাস বাংলাদেশের ফাজেল ক্লাসের অনুরূপ। কামিল মমতাজুল মোহাদ্দেসীন নামে অবশ্য ২৯ জন ছাত্র নিয়ে একটি ক্লাশ চালু রয়েছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে একটি সরকারী আলিয়া মাদ্রাসার (কলেজ?) এই বেহাল অবস্থা দেখে চোখে অশ্রু এসে গেলো। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের দ্বীনী শিক্ষার এইতো করুণ অবস্থা। একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র- আল্লাহর কত বড় নেয়ামত- তা টের পেলাম কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার করুণ অবস্থা দেখে।

আলিয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে গেলাম হযরত মাওলা আলী (রহঃ)এর মাযার যিয়ারত করতে। কলকাতার মধ্যে এই মাযারটিই শ্রেষ্ঠ মাযার বলে পরিচিত। এছাড়া আছে খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ মাযার। ১৮৬১ খৃঃ হযরত মাওলা আলী (রহঃ) ইনতিকাল করেন এবং খিদিরপুর মাযারের হযরত সৈয়দ আলী শাহ বাবা (রহঃ) ১১১৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। মাওলা আলীর মাযারে ফাতেহা পাঠ করে সমবেত কণ্ঠে মিলাদ শরীফ শুরু করতেই অগণিত

লোক এসে তাতে যোগদান করে এবং মুনাজাতে শরীক হয়। এরপর গেলাম হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বাগদাদী (রহঃ) ও হযরত ফকির হিন্দ (রহঃ) নামক দু'জন ওলীর মাযার যিয়ারত করতে। খাদেম সাহেব বললেন- তাঁরা হযরত গাউসে পাকের ২২তম আওলাদ। যিয়ারত শেষে নাখোদা মসজিদ দেখতে রওনা হলাম। জাকারিয়া ষ্ট্রীট যেতে হাওড়া হয়ে ওয়ানওয়ে রাস্তায় যেতে হয়। দুপুরে নাখোদা মসজিদে যোহর নামাজ আদায় করে বোম্বে হোটেলে খানা সেরে নেই। অবিভক্ত ভারতে নাখোদা মসজিদ ছিল সুন্নী মুসলমানদের কেন্দ্র। তার ইমাম ও খতীব ছিলেন মরহুম মাওলানা মুফতী আমিমুল ইহসান (রহঃ) সাহেব। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসার পর উক্ত বিখ্যাত মসজিদটি ওহাবী তাবলীগীরা দখল করে নেয়। ১৩ই অক্টোবর নিউমার্কেট, পাতালপুরী ট্রেন ও বিরলা তারামন্ডল দেখার পালা। গড়ের মাঠের পাশে বিরলা তারকা মন্ডল ১২ রূপীর টিকিট কিনে দেখতে গেলাম দিনের ২টায়। ৩০ মিনিটে দেখানো হলো আকাশের চাঁদ- সুরুয ও তারকা মন্ডলের বিভিন্ন গতিপথ এবং হিন্দুমতে বিভিন্ন জোতিষ্কমন্ডলীর প্রভাবের তথ্য- ইত্যাদি। জোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে এতে। মুসলমান বিশ্বাস করে- এক আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। পাতালপুরী ট্রেন জ্যোতিবসু সরকারের এক অমর কীর্তি। যানজটের

অবসানকল্পে টালিগঞ্জ হতে দমদম বিমান বন্দর পর্য্যন্ত এই পাতালপুরী রেল লাইন বিস্তৃত- অফিস সময়ে এগুলো চলাচল করে। খুবই দ্রুত এবং ভাড়াও কম।

দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা

১৪ই অক্টোবর রাত ৮টা। কলকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে লালকিল্লা এক্সপ্রেস নামক লোকাল ট্রেনে রওয়ানা হই দিল্লীর উদ্দেশ্যে। ৩৬ ঘন্টার পথ- অর্থাৎ দুই রাত একদিনের পথ। উক্ত ট্রেনের রুট হচ্ছে পাটনা, বিহার, মোগল সরাই, এলাহাবাদ, কানপুর ও আলীগড় হয়ে দিল্লী। দূরত্ব ১৫৫৪ কিঃ মিঃ। প্রথম রাত্র পার করে সকাল ৯টার সময় দেখি- স্থানীয় লোকেরা বক্সারে যাবে অফিস করতে ১০০ কিঃমিঃ দূরে। তারা জোর করে আমাদের রিজারভেশন সিটে বসে পড়ে। বলার কিছু নেই। ঐতিহাসিক বক্সার যুদ্ধে মীর কাসিম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হলে লর্ড ক্লাইভ নিজ হাতে ক্ষমতা নিয়ে নেন- হিন্দুদের সহায়তায়। মনে পড়লো- একারণেই হয়তো স্থানীয় হিন্দুরা মুসলমানদের উপর খুব ক্ষেপা। দিন পার করে বিকালে মোগল সরাই গিয়ে পৌছলাম। সেখান থেকে এলাহাবাদ, সাসারাম, কানপুর হয়ে ট্রেনটি ৮০০ কিঃ মিঃ পথ চলে ১৬ তারিখ ভোর রাত্র ৪.৩০ মিনিটে ৪ ঘন্টা পূর্বেই দিল্লী জংশনে পৌছালো। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ষ্টেশন থেকে বেবী যোগে দিল্লী জামে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করে হোটেলের খোঁজ করতেই গলির ভিতরে চুড়িওয়ালান গলিতে হোটেল সীমা লজে ২১ সিট পেয়ে গেলাম। মোটামোটি ভাল ও প্রশস্ত। ঐ দিনই ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার জুমা পড়ে বের হয়ে পড়লাম লালকিল্লা দেখার উদ্দেশ্যে।

লালকিল্লাঃ অনেক উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী

দিল্লীর লালকিল্লা মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির যেমন এক উজ্জ্বল নিদর্শন, তেমনি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনেরও এক নীরব সাক্ষী। লালকিল্লার দিওয়ানে আম ও দিওয়ানে খাসে ময়ুর সিংহাসনে বসে সম্রাট শাহজাহান সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনে ১৮৫৭ খৃঃ শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ইংরেজরা বন্দী করে এই দিওয়ানে খাসে বসেই তাকে স্বপরিবারে বার্মায় নির্বাসিত করার জন্য বিচারের নাটক করেছিল। এই দিওয়ানে খাসে বসেই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ৫ম জর্জ বঙ্গভঙ্গের পূর্ব আদেশ (১৯০৫ইং) রহিত করে পুনরায় ঢাকা ও আসামকে কলকাতার অধীনস্থ করে দিয়েছিল।

আগ্রায় ১১ বৎসর রাজধানী থাকার পর সম্রাট শাহজাহান স্থানাভাবে দিল্লীতে পুনরায় রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৯ বৎসর ৩ মাসে লালকিল্লা দূর্গ তৈরী করে তিনি দিল্লীতে পুনরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই দূর্গে রয়েছে পশ্চিম মুখী দুটি প্রধান গেইট- দিল্লী গেইট ও লাহোর গেইট। ভিতরে রয়েছে প্রথমে সৈন্যদের ব্যারাক, তারপর আমির উমরাহদের প্রাসাদরাজী। তারপর দিওয়ানে আম, দিওয়ানে খাস। তারপর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের অন্দর মহল ও বিভিন্ন প্রাসাদ, মোতি মসজিদ, বিভিন্ন ফোয়ারা, স্তরে

স্তরে সাজানো বিনোদনের প্রাসাদসমূহ। পূর্ব দিকে ৭০ ফুট উঁচু দেওয়াল। গভীর খাল দ্বারা দূর্গটি পরিবেষ্টিত- যাতে শত্রুরা তা অতিক্রম করে দূর্গে প্রবেশ করতে না পারে। দূর্গটি উত্তরে-দক্ষিণে ৩২০০ ফুট দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৮০০ ফুট প্রস্থ। প্রায় দেড়মাইল আয়তনের এলাকা জুড়ে লালকিল্লা অবস্থিত। চোখে না দেখলে তার সৌন্দর্য কাহিনী বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী মুসলমানদের এই অতীত গৌরবগাথা নিদর্শনটি দেখতে যায় এবং তপ্ত দুফোটা অশ্রু ঝরিয়ে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করে। লালকেল্লা যত্নের অভাবে দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কার এত গরজ- মুসলমানদের এই গৌরব গাঁথাকে ধরে রাখার? যাদের জিনিস- তারাই যখন ধরে রাখতে পারেনি- অন্যের কি এত গরজ? কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ এক আজব দেশ। মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু নিদর্শন খুঁজে বের করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তার বিপরীতে ভারতে লালকেল্লা, জামে মসজিদ, কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ও কুতুব মিনার অযত্নে ও অবহেলায় দিন দিন ক্ষয় ও লয় হয়ে যাচ্ছে। জামে মসজিদে জুমার নামায পড়ে ২১ জন ঢুকলাম কেল্লা দেখার জন্য। কিন্তু টুপ টুপ বৃষ্টির কারণে ধীরে সুস্থে কিছুই দেখতে পারিনি। তাড়াহুড়া করে ঘুরে বের হয়ে আসি। জনশ্রুতি আছে- লাল কিল্লার তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে আগ্রা দূর্গ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ২০০ কিঃ মিঃ পথে যমুনা নদীর বাঁকে বাঁকে সুড়ঙ্গ পথ করা হয়েছিল- সৈন্য চলাচল ও বিপদকালীন নিরাপত্তার জন্য। ইংরেজগণ সেইপথ নাকি সীল করে দিয়েছে। লালকেল্লার দিওয়ানে খাসে লিখা ছিল-

স্বর্গ যদি থাকে কোথা এই ধরা ধামে
এই খানে- এই খানে! তাহা এইখানে !

দিল্লী জামে মসজিদ ও ফতেহপুরী মসজিদ-মাদ্রাসা পরিদর্শন

সম্রাট শাহজাহানের অমর স্থাপত্যের নির্দশনগুলির মধ্যে দিল্লীর শাহী জামে মসজিদ ও ফতেহপুরী মাদ্রাসা- মসজিদ অন্যতম নির্দশন। লালকিল্লার পশ্চিম-দক্ষিণ বাহু- দিল্লী গেটের সোজা পশ্চিমে জামে মসজিদ ও মিনা বাজার এবং পশ্চিম-উত্তর বাহু- লাহোর গেটের সোজা পশ্চিমে চাঁদনী চক রোডের পশ্চিম মাথায় ফতেহপুরী মসজিদ ও আলীয়া মাদ্রাসা এখনও দিল্লীর মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র রূপে কাজ করছে। এখন এগুলোর মূল্যায়ন হচ্ছে- কেন এত টাকা খরচ করে এগুলো তৈরী করা হয়েছিল? এসব নিদর্শন না থাকলে হিন্দুস্থান থেকে হিন্দুরা এতদিনে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। ১৬ই অক্টোবর লালকিল্লা দর্শনের পূর্বে জুমা পড়লাম জামে মসজিদে। দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব গেইট দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মুসল্লীগণ সুউচ্চ মসজিদ চত্বরে উঠে নামাজ আদায় করে। মূল মসজিদে মাত্র ৪/৫ কাতার মুসল্লী বসতে পারে। তারপর বারান্দা ও খোলা চত্বর। প্রায় লক্ষাধিক মুসল্লীর স্থান সঙ্কুলান হবে। মসজিদের সুউচ্চ মিনারে পূর্বে টিকিট করে উঠার ব্যবস্থা ছিল। এখন বন্ধ। মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে সুরক্ষিত কোঠায় নবী করিম (দঃ)-এর পবিত্র দাঁড়ি মোবারক ও কদম মোবারকের ছাপ এবং জুতা মোবারক সংরক্ষিত আছে। বাদশাহ তৈমূর লং এই পবিত্র নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। সম্রাট বাবর তৈমূর লং এর উত্তরসূরী হিসাবে এগুলো সংরক্ষণ করেন। অতঃপর সম্রাট শাহজাহান সযত্নে এই পবিত্র নিদর্শন জামে মসজিদে স্থাপন করেন। এখানে হযরত আলী (রঃ)-এর কুফী হস্তাক্ষরে

লিখিত কোরআন মজিদের অংশ বিশেষ, হযরত ইমাম হাসান-হোসাইন (রাঃ)-এর হস্তলিখিত পাক কোরআন মৌজুদ আছে। খাদেম সাহেব জুমার পর সমবেত মুসল্লীগণকে লাইনে দাঁড় করিয়ে এই পবিত্র নিদর্শন ও বরকতময় তাবাররুক সমূহ প্রদর্শন করে থাকেন। যিয়ারতকারীর মনের অবস্থা তখন কেমন হয়, তা ভুক্তভোগীই উপলব্ধি করতে পারেন। এই জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠাকালে তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারীর প্রশ্নে ৪০ বৎসর আছর নামাজ বিনা কাজায় আদায় করার শর্ত দেয়া হয়েছিল। দেখা গেল- বাদশাহ শাহজাহানই একমাত্র ব্যক্তি- যার ৪০ বৎসর আছর কাজা হয়নি। অবশেষে তাকেই প্রথম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে হয়েছিল। এই জামে মসজিদে অনেক পীর, দরবেশ ও কুতুবগণের আগমন হয়েছিল। কিন্তু আজ সেই মসজিদের ইমাম বোখারী সাহেব কংগ্রেস ও বিজেপি'র রাজনীতি উক্ত মসজিদে ঢুকিয়েছেন। আমাদের আজমীরগামী গাড়ীর চালক মোঃ নাঈম দুঃখ করে বললোঃ

দিল্লী কো বরবাদ কিয়া তিন চিজোঁ নে-
তেহারী, বিহারী আওর আব্দুল্লাহ্ বোখারী।
অর্থাৎ- তিনটি জিনিস দিল্লীকে বরবাদ করেছে-
তেহারী, বিহারী এবং আব্দুল্লাহ বোখারী।

গাড়ী চালক একজন মূর্খ মানুষ। সে শুনেছে হয়তো কোন সচেতন শিক্ষিত লোকের মুখে। একথার অন্তর্নিহিত মর্ম খুবই গভীর এবং অতি মূল্যবান। ভারতের মুসলমানদের বরবাদীর কারণ তিনটি- যার একটি হচ্ছে তেহারী অর্থাৎ

ভোগ বিলাস এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে- বিহারী আদমী এবং ফাইনাল হচ্ছে-স্বয়ং আব্দুল্লাহ বোখারী। একবার কংগ্রেস, একবার বিজেপি সমর্থন করে ভারতের মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলে কচু কাটা করার পথ তিনি সুগম করেছেন। ভারতের মুসলমানরাই একথার পূর্ন ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। এজন্যই হয়তো উক্ত খেদোক্তি।

ফতেহপুরী মসজিদ ও মাদ্রাসা দিল্লীর বাদশাহী শিক্ষা ব্যবস্থার এক প্রাচীন নিদর্শন। চট্টগ্রামের মাওলানা আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ) উক্ত মাদ্রাসার কৃতি ছাত্র ছিলেন। আলীশান গেইট, খোলা চত্বর, ওজুর হাউজ, দুদিকে প্রাসাদ তুল্য মাদ্রাসা ভবন এবং সর্ব পশ্চিমে শাহী মসজিদ। মাগরিবের নামাজ পড়লাম সেখানে। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজিজের মাদ্রাসায়ে রহিমিয়া শহর হতে একটু দূর বিধায় যাওয়ার সময় পাইনি।

দিল্লীর যাবতীয় জৌলুস লালকিল্লা, জামে মসজিদ, চুড়িওয়ালা রোড, চাঁদনীচক রোড ও মার্কেট, ফতেহপুরী মসজিদ ও রেলওয়ে জংশনকে ঘিরে আবর্তিত।

হিন্দুস্থানে প্রথম স্থায়ী মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

১১৯০ খৃষ্টাব্দে খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ)-এর আজমীর শরীফে আগমনের দুই বৎসরের মাথায় ১১৯২ সালে তারাইনের যুদ্ধে রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে সুলতান মোহাম্মদ ঘুরী দিল্লীতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন- যার স্থায়ীত্ব হয়েছিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৬৬৭ বৎসর। এই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ পত্তনের মূলে অবদান ছিল খাজা গরীব নাওয়াজের। তিনিই স্বপ্নে মুহাম্মদ ঘোরীকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। খাজা গরীব নাওয়াজকে অনুসরণ করে কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ), ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শক্বর (রহঃ), নিযামুদ্দীন আউলিয়া, আমির খসরু, নাসির উদ্দীন রৌশন চেরাগ দেহলী, সাবের কালিয়ারী, শাহ বুআলী কলন্দর প্রমূখ ইসলাম প্রচারকগনের প্রচেষ্টায় ভারতে মুসলিম সমাজ ও সাম্রাজ্য মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই সমগ্র ভারতবাসী তাঁদের কাছে ঋণী এবং তাঁদের দ্বারস্থ হয়ে প্রশান্তি ও প্রেরণা লাভ করে থাকেন। অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে যদি কোন ওলী বা গাজীর আগমন ঘটে ভারতভূমে- তাহলে দিল্লী তার অতীত গৌরব পুনরায় ফিরে পেতে পারে। তবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে হবে এবং ষ্টেজও তৈরী হতে হবে। তারপরই আগমন ঘটবে মহান নায়কের। এ প্রস্তুতি দু'ভাবে হতে পারে। (১) ইসলামের ঘোর দুর্দিন ও মুসলমানদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন, (২) পূর্ব গৌরব পুনরোদ্ধারের দুর্জয় ও দুর্বার চেতনা। প্রথমটির প্রাদুর্ভাব না হলে দ্বিতীয়টির আত্মপ্রকাশ সাধারণতঃ ঘটেনা। উভয়টির মিলনেই বিষ্ফোরন ঘটার সম্ভাবনা বেশী। আমরা খাজা গরীব নওয়াজের রূহানী প্রতিনিধির আগমণের প্রতীক্ষায় আছি।

সেকেন্দ্রা, আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রি ভ্রমণ

আমাদের সিডিউল মতে আজমীর শরীফ যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুটি টাটা সমু মাইক্রো বাস ৪ দিনের জন্য চুক্তি করে নিলাম। ৪ দিনে ১৩ হাজার রূপিতে চুক্তি হলো এক দালালের সাথে। দালাল নিয়ে এলো নাঈম নামে এক ড্রাইভারকে। পরদিন ১৭ই অক্টোবর শনিবার ২১ জনের কাফেলা রওয়ানা হলাম। সোজা আজমীর না গিয়ে আগ্রা হয়ে যাওয়ার চুক্তি করা হয়েছিল। সেমতে আগ্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হলো। গতরাতে অগ্রিম তিন হাজার রুপী দিয়েছিলাম। পরদিন ড্রাইভার যাত্রাকালে আরও দু'হাজার রূপী দাবী করায় কিছু কথা কাটাকাটি হলো। এতে বেশ বিলম্ব হলো। দু'হাজার রূপী পুনরায় দিয়ে ৯ টায়

আগ্রার পথে রওয়ানা হলাম। দিল্লী হতে আগ্রার দূরত্ব ২০০ কিঃমিঃ। পথে এক জায়গায় নাস্তা করলাম। মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে সেকেন্দ্রা পৌঁছলাম বেলা ১.৩০ মিনিটে। মাথাপিছু ১২ রূপী টিকিট কিনে ঢুকলাম সম্রাট আকবরের সমাধি দেখতে। দোর্দন্ড প্রতাপে দীর্ঘ ৫০ বৎসর যিনি মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন, তার কবর দর্শন করা। শুধু দর্শন করলাম, কিন্তু যিয়ারত করতে মন চাইলনা। কেননা, তিনিই দীনে এলাহী জারি করে দীন ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। পঞ্চ ধর্মের (ইসলাম, খৃষ্টান, পার্শী, হিন্দু ও জৈন) সারমর্ম নিয়ে তিনি নূতন ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রহঃ), শেখ আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ), শেখ আব্দুল কাদের বদায়ুনী (রহঃ) ও মোল্লা দো- পেয়াজা (রহঃ) প্রমূখ মনিষীগণ আকবরের উক্ত ধর্ম মতের বিরুদ্ধে তুমূল আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে খান খান করে দিয়েছিলেন। তাই মন চাইলনা দোয়া

পড়তে। তিনি ধর্ম নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন- এ অনিচ্ছা তারই বহিঃপ্রকাশ কিনা জানিনা। তার সমাধি চত্বরে অসংখ্য বাঁদর আর লম্বা লেজ বিশিষ্ট হনুমানের দল দেখলাম। হিন্দু মুসলমানকে এক করে যিনি ধর্ম নিরপেক্ষতার বাঁদরামী রাজত্ব পরিচালনা করেছিলেন, তারই পরিণতি দেখলাম স্বচক্ষে। এজন্যই দেশ ভ্রমন করা ওলীগণের সাধনারই অংশ বিশেষ হয়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি করে সেখান থেকে আগ্রার তাজমহলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যমুনা নদীর ডানতীরে আগ্রা দূর্গ এবং আরও কিছুদূর অগ্রসর হলেই যমুনার ডান ও দক্ষিণ তীরে সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল নজরে পড়লো। নদীর পানিতে তাজমহলের প্রতিচ্ছবি দেখেই মন আনন্দে ভরে উঠলো।

তাজমহল

আগ্রার তাজমহল সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগমের সমাধিস্থান। যমুনা নদী দিল্লীর পূর্ব প্রান্ত দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে আকাঁবাঁকা হয়ে উত্তরে-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে আগ্রায় গিয়ে পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে। এই মোড়েই দক্ষিণ তীরে নদী তীর হতে ৭০ ফুট উঁচু প্লাটফরমে তাজমহলের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। প্রিয়তমা স্ত্রী-প্রেমের এক পবিত্র নিদর্শন এই তাজমহল। তাজমহল দেখলেই মনের গহীনে এক পবিত্র প্রেমের ছবি ভেসে উঠে। তাজমহলের পশ্চিম পাশেই রয়েছে বিশাল চত্বর বিশিষ্ট শাহী মসজিদ। আর পূর্ব পার্শে রয়েছে শাহী মহল- যেখানে বসে সম্রাট নিজ স্ত্রীর সমাধির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য! বর্তমানে সেটি মেহমানখানা।

বেলা ৩-৩০ মিনিটে মাথাপিছু ১৫ রূপীর টিকিট নিয়ে শাহী গেইট দিয়ে দূর্গের ভিতরে ঢুকলাম। ইয়া আল্লাহ! বিশাল লম্বা লাইন ধরে লোক সামনে

এগুচ্ছে। সরকারী বাহিনী শরীর তল্লাশী করে এক এক করে দর্শনার্থী ভিতরে ঢুকাচ্ছে। অবশ্য খুব শৃংখলার সাথে তাড়াতাড়িই কাজ সমাধা করা হচ্ছে। হৈ চৈ মোটেই নেই। নিত্যদিন একই দৃশ্য। এক তাজমহলেই ভারতীয় সরকারের পর্যটন খাতে কত মুদ্রা আয় হচ্ছে- তা তারাই বলতে পারবে। সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি প্রদর্শন করে আজ সরকারের বিরাট আয়ের সংস্থান হচ্ছে। তাজমহল- নির্মাণ বর্তমান যুগে মূল্যায়ন হচ্ছে ভিন্নভাবে। মুসলমানদের অতীত গৌরবের উজ্জ্বল নিদর্শন হচ্ছে তাজ। কিন্তু আমরা ধরে রাখতে পারিনি তার লাজ। তাই বিধর্মীরা এর মালিক আজ।

তাজমহলের মুখ দক্ষিণ দিকে আর উত্তর দিকে নদী ঘেঁষে তার পিছন দিক। কিন্তু তাজের বিশাল প্লাটফরম বা চতুর্দিকের চত্বর দেখলে মনে হয় সব দিকেই তার মুখ। নিখুত পরিমাপ ও নিখুত কারুকার্য এবং কুরআন মজিদের খোদাই-সৌকর্য দেখলে তাজমহলকে দুনিয়ার জান্নাত বলেই মনে হয়। তাজের প্রতি আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির পিছনে আমার পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রতম সম্পর্ক আছে। তাই যিয়ারত কালে এক মর্মস্পর্শী বেদনা অনুভব করি। সম্রাট শাহজাহান ২০ হাজার শ্রমিক ও কারিগর দিয়ে ২২ বৎসরে তাজমহলের নির্মাণ কাজ সমাধা করেছিলেন। প্রেমের পরীক্ষায় কত ধৈর্যের প্রয়োজন হয়- তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর তাজমহল। তাজমহল দূর্গের চতুর্দিকে ৪টি শাহী মসজিদ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু হায়! মুসল্লী কোথায়? মুসলিম রাষ্ট্র থাকলে ঐ মসজিদগুলোর জৌলুস অবশ্যই থাকতো। আগ্রায় বড় বড় ওলামা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এক কালের রাজধানী হিসাবে আগ্রা ইসলামী কেন্দ্রও ছিল। আগ্রাতে সুন্নী মুসলমানের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি। তাজমহল দেখে সন্ধ্যার দিকে বের হয়ে রাত ৮ টার দিকে ফতেহপুর সিক্রির হযরত সেলিম চিশতী (রহঃ) এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। রাত ১০ টায় পাহাড়ের উপর গাড়ী নিয়ে উঠি। ১৩৪ ফুট উচু সিংহ দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হযরতের যিয়ারত কাজ সমাধা করি। সম্রাট আকবর প্রথমদিকে ভাল ছিলেন। সে সময় তিনি মান্নত করেছিলেন- যদি আল্লাহ তাঁকে সন্তান দান করেন, তাহলে আগ্রা হতে পায়ে হেঁটে হযরত সেলিম চিশতী (রহঃ) এর মাজার যিয়ারত করবেন। আল্লাহ তার মান্নত পূরণ করেন এবং সেলিম জাহাঙ্গীর বাদশার জন্ম হয়। পরে আকবর হযরতের মাজার পাকা করেন এবং ১৩৪ ফুট উঁচু শাহী দরজা তৈরী করেন।

আজমীর শরীফ রওনা

ফতেহপুর সিক্রি যিয়ারত করে জয়পুর হয়ে আজমীর শরীফ রওয়ানা হই। পথে এক দোকানের খোলা চত্বরে বসে রাত্রে চা নাস্তা করি। ১৮ই অক্টোবর সকালে ৮/৯টার দিকে আজমীর শরীফ গিয়ে উপস্থিত হই। খাদেম ইকবাল উদ্দীনের ভাড়া করা ভবনে তিনি আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। চার ফ্যামেলীর জন্য পৃথক চার কামরা এবং অন্যদের জন্য দু'টি কামরার ব্যবস্থা করা হয়। মোটামোটি মধ্যম মানের থাকার ব্যবস্থা। খাদেমগণের ব্যবহার প্রশংসনীয়। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে ২টার দিকে খাদেম সাহেব আমাদেরকে নিয়ে যিয়ারতে যান। দু'খানা গিলাফ ও একখানা কার্পেট নিয়ে আমরা খাজা গরীব নাওয়াজ (রহঃ) এর পবিত্র মাজারে হাজিরা প্রদান করি। গিলাফ চড়িয়ে যিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করার পর জান্নাতী দরজায় এসে (পশ্চিম) কার্পেট বিছিয়ে দেই এবং মিলাদ শরীফ পাঠ করি। আমাদের সাথে হিন্দুস্তানী একদল আলেম ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) বেরেলভীর মশহুর মিলাদের কাসিদা- "মোস্তফা জানে রহমত পে লাখে ছালাম" পাঠ করেন।

আনা সাগর দর্শন

ঐ দিনই বিকালে আনা সাগর দেখতে যাই। খাজা বাবার মাজার শরীফ থেকে সোজা উত্তরদিকে প্রায় ১ কিঃ মিঃ দূরে আনা সাগর ও সদা বাহার পাহাড়। এখানে এসেই ১১৯০ ঈসায়ী সনে (৫৮৬ হিঃ) তিনি প্রথম সদা বাহার পাহাড়ে

চিল্লায় বসেন। পাশেই ফীলখানা বা রাজার হাতীখানা এবং অদুরে রাজা পৃথিরাজের বাড়ী। খাজা বাবা প্রথমে ফীল খানায় ৪০ জন সহচর নিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু কর্মচারীরা এই বলে খাজা বাবাকে সরে যেতে বললো যে, এখানে রাজার হাতীপাল থাকে। খাজা বাবার কারামতে হাতীগুলো শুয়ে পড়লো- আর উঠানো গেলনা। অবশেষে- খাজা গরীব নওয়াজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় হাতীরা উঠে আসে। খাজা বাবা একটু সরে গিয়ে পশ্চিমে আনা সাগরের তীরে আশ্রয় নিলেন। সেখানেও অত্যাচার। রাজা জয়পাল নামক বড় যাদুকরের যাদুবান নিক্ষেপ এবং খাজা বাবার আশ্চর্য কারামত গুণে তার শাস্তি প্রদান। অবশেষে তার ইসলাম গ্রহণ এবং সর্বোপরি আনা সাগরের পানি বন্ধ করে দেয়ার কারামত। খাজাবাবা আনা সাগরের যাবতীয় পানি-এমনকি মানুষের বুকের দুধ পর্যন্ত এক লোটার মধ্যে নিয়ে আসেন। খাজা বাবার এসব কারামত এই সদাবাহার পাহাড় এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল। এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই হযরত খাজা গরীব নাওয়াজ হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রচার করেন। মাত্র ৪৬ বৎসরে খাজা বাবা নব্বই লক্ষ বিধর্মীকে ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে ঘোর রাজ্যের অধিপতি মুহাম্মদ ঘুরীকে তিনি স্বপ্ন যোগে দিল্লী আক্রমনের

আমন্ত্রন জানান। এই অভিযানেই মুহাম্মদ ঘুরী রাজা পৃথিরাজকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লী জয় করেন এবং হিন্দুস্থানে স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। কাজেই ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খাজা গরীব নওয়াজের একক অবদান স্বীকার করতেই হবে। পরবর্তীতে হযরত শাহজালাল (রহঃ) এসে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। সুতরাং ভারত ও বাংলাদেশ হযরত খাজাবাবা ও হযরত শাহ জালাল বাবার দেশ- ওলীদের দেশ। আমরা তাঁদের ওছিলায় মুসলমান হয়েছি। তাই তাঁদের কাছে চিরঋণী। এইদেশ টিকাতে হলে ওলীদের আদর্শের ভিত্তিতেই টিকানো সম্ভব- অন্য কোন পথে নয়। যারা ওলীদের সাথে দুশমনি পোষণ করে অথচ বাংলাদেশে অন্য ধরনের ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার স্বপ্ন দেখে, তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে দেয়া যাবে না এবং সে রাষ্ট্রও টিকে থাকবেনা। খাজা গরীব নওয়াজের এই কারামতপূর্ণ স্থান সংরক্ষণের নিমিত্তে সম্রাট শাহজাহান আনা সাগরের পূর্ব তীর মর্মর পাথর দিয়ে বাধাই করে দেন এবং সিঁড়ি তৈরী করে দেন।

আমরা আনা সাগর দেখে সদা বাহার পাহাড়ের একটি সুড়ঙ্গ যিয়ারত করলাম- যেখানে বসে হযরত বখতিয়ার কাকী (রহঃ) রিয়াজত করতেন। খাজা বাবার নির্দেশে দিল্লী যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর শোকে উক্ত পাহাড়-গুহা কেঁদেছিল- যার ফোটা ফোটা অশ্রু চিহ্ন আজও বিদ্যমান রয়েছে।

আমরা যখন দরগাহ্ শরীফে ফিরছিলাম - তখনই দেখলাম বোম্বাই হতে আগত একটি কাফেলা নিশান ও ব্যানার হাতে মিছিল করে দরগাহ শরীফের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তাদের গগনবিদারী শ্লোগান ছিল-

(১) নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার (২) নারায়ে রিসালাত-ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (৩) নারায়ে খাজা – ইয়া খাজা গরীব নওয়াজ (৪) হামারে খাজা-হিন্দ কা রাজা (৫) খাজা কা দামান- নেহী ছোড়েঙ্গে (৬) রাসুল কা দামান- নেহী ছোড়েঙ্গে।

উক্ত শ্লোগান গুলো সাথে সাথে নোট করে নিলাম। আমাদের বাংলাদেশের একশ্রেণীর পীর মাশায়েখ আছেন- যারা নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসুলাল্লাহ (দঃ) কে এক সময় হারাম ও শিরক বলতেন। বর্তমানে তারা সুর পরিবর্তন করে "নারায়ে রিসালাত - মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বলেন। কিন্তু মদিনাবাসী সাহাবীগণ ও পরবর্তী সকল মুসলমানের শ্লোগান ছিল "ইয়া মুহাম্মদ বা ইয়া রাসুলাল্লাহ। (দেখুন- ইবনে কাসিরের বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থে ইয়ামামা যুদ্ধ প্রসঙ্গ) আল্লাহ এসব কম শিক্ষিত পীরদের জেহালত থেকে সাধারন ও সরল প্রাণ মুসলমানকে বাঁচিয়ে রাখুন। এরা মানুষকে ভুল তথ্য পরিবেশন করে ঈমান হারা করছে। এর জন্য এরাই দায়ী হবে। অথচ এদের দায়িত্ব ছিল রাসুল প্রেম শিক্ষা দেয়া। কিন্তু এরা এর বিপরীত শিক্ষা দিচ্ছে। বাংলাদেশের চিহ্নিত কয়েকটি দরবার এই রোগে আক্রান্ত। এর বিপরীতে হাক্কানী পীরগণ সঠিক আকিদা ভিত্তিক তরিকত পরিচালনা করছেন। কিন্তু বাতিল পীরগনের প্রভাব খুবই বেশী। তাদের সাথে হালে যোগ দিয়েছে জামাত শিবির, তাবলীগ, দেওবন্দ ও আহ্লে হাদীস প্রমুখ নিরেট বাতিল পন্থীরা। বাংলাদেশে দু'প্রকারের পীর আছেনঃ (১) যারা হযরত বড় পীর ও খাজা বাবার ন্যায় নির্লোভ ওলী। তাঁরা গদী লোভী নন। (২) গদী

লোভী পীর। শেষোক্ত শ্রেণী এক এক সময় এক এক রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি সৃষ্টি করে এরা কিছু সুবিধার বিনিময়ে নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করে। এদের কারনেই মানুষ ওলীদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিরূপ মন্তব্য করে থাকে।

সারওয়ার শরীফ ও তাড়াগড় পাহাড়ে গমন

পূর্ব প্রোগ্রাম মতে ১৯ শে অক্টোবর সোমবার আজমীর শরীফ হতে দক্ষিণ পূর্বে ৬৫ কিঃ মিঃ দূরে সারওয়ার শরীফ যিয়ারত করতে রওনা হই। হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) এর তিন সাহেবজাদা- হযরত ফখরুদ্দীন চিশ্‌তী (রহঃ), হযরত হোসামুদ্দীন চিশতী (রহঃ) ও হযরত জিয়াউদ্দীন চিশ্‌তী-এর মধ্যে প্রথমজন পরবর্তীকালে আজমীর ত্যাগ করে সরওয়ার শরীফে চলে যান এবং সেখানে জমি জমা চাষাবাদ করে জীবন অতিবাহিত করে সেখানেই ইনতিকাল করেন। তাঁর পবিত্র মাজার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করি। যিয়ারত কালে মিলাদ শরীফে এক অব্যক্ত স্বাদ অনুভব করি এবং ফয়েজ ও বরকতের এক অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করি। মাজার সংলগ্ন মসজিদও মাদ্রাসায় আমরা সবাই সাধ্যমত দান করি। মাজার শরীফের দক্ষিণে বিশাল দীঘির দক্ষিণ পাড়ে হযরত গুল বাদশাহ (রহঃ) এর পাশে শুয়ে আছেন হযরত মাজু শাহ (রহঃ)। সারওয়ার শরীফ থেকে ফেরত আসার পথে দেখলাম উটের বিরাট বহর।

উটের বহর

আসার পথেই তাড়াগড় পাহাড়ে ৩০০ শহীদানের মাজার যিয়ারত করার

উদ্দেশ্যে গাড়ী নিয়ে আরোহন করি। সমুদ্র লেবেল হতে ১৮০০ ফুট উঁচু পাহাড়ে হযরত সৈয়দ মীরা হোসাইন খেংসাওয়ার (রহঃ) তিনশত শহীদান সহ চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন। তাঁর ঘোড়ার কবরও সেখানে রয়েছে। হযরত সৈয়দ মীরা হোসাইন খেংসাওয়ার (রহঃ) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আজমীর শরীফ আগমন করেছিলেন- খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) এর পূর্বে। তাড়াগড় কিল্লা জয় করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গী সাথী সহ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শেষ পর্য্যন্ত শহীদ হন এবং তাড়াগড় পাহাড়ের উপরই তাঁদের দাফন করা হয়। (দেখুন শওকতে খেংসাওয়ার- লেখক মুন্সী সৈয়দ হাসান) সেখানে ১৭ই রজব তিন দিনব্যাপী উরস উদযাপিত হয়। সেখানে ৩টি বড় ডেক বসানো আছে। আজমীর শরীফ যিয়ারতকারীগণ তাড়াগড় পাহাড় যিয়ারত না করলে মনে হয় কিছুই করা হলোনা। তাই সাধারণতঃ লোকেরা কষ্ট করে পায়ে হেটে অতি কষ্টে পাহাড়ের চুড়ায় উঠে যিয়ারত করে আবার পায়ে হেটেই নীচে নেমে আসেন। এতে অনেকেরই কষ্ট হয়। বর্তমানে পাহাড়ের পূর্ব পাশ দিয়ে গাড়ীর রাস্তা করা হয়েছে। ১৯ তারিখে তাড়াগড় পাহাড়ের মাজার যিয়ারত করে আজমীরের যিয়ারত কাজ সমাপ্ত করি। এরপর যার যার ব্যক্তিগত কেনাকাটায় রাত ১০টা বেজে যায়। পরদিন ২০ শে অক্টোবর মঙ্গলবার দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা। গভীর রাতে খাজা বাবার মাজার শরীফ নিরিবিলি যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আমি ও জামাল সাহেব গমন করি। গিয়ে দেখি- ছোট ডেকে ৮০ মনের নেয়াজ তৈরীর কাজ চলছে। মনে বড় তৃপ্তি আস্‌লো- সকালে হয়তো তাবারুক পাবো। এসময় সাধারণতঃ তাবারুক তৈরী হয় না। রজবের চাঁদ তখনও শুরু হয়নি। রজবের ১ তারিখ থেকে তাবারুক পাকানো হয়। ভাগ্যগুনে আমরা এর ২ দিন আগেই-

পেয়ে গেলাম। রাত্রে এক পাগলকে দেখলাম- খাজা বাবার শানে অসংখ্য কাসিদা দরাজ গলায় পড়ছে আর বুলন্দ দরওয়াজার সিড়িতে মাথা কুট্‌ছে। আর আশেক প্রেমিকরা তার স্বাদ গ্রহন করছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে রাত দু'টার দিকে যিয়ারতের কাজ সেরে হোটেলে ফিরে আসলাম।

বিদায় আরজ

২০ শে অক্টোবর ফজরের জামাত শেষ করে মাযার শরীফের দক্ষিণ দরজা বাবে রহমতে অনুষ্ঠিত মিলাদ শরীফে যোগদান করে আখেরী যিয়ারত ও সালাম পেশ করে বিদায় আরজ করলাম। হোটেলে এসে দেখি- ২১ জনের জন্য এক বালতি তাবারুক এসে গেছে। সাধ্যমত তাবারুক খেয়ে বাকী কিছু সাথে নিয়ে আসলাম। কত স্বাদ ও কত বড় নেয়ামত— তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না।

আজমীর শরীফ বলতে আমরা খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) এর মাজার শরীফকেই প্রধানতঃ বুঝে থাকি। আর এটুকুই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ঠ। হযরত খাজা বাবার দরগাহ শরীফকে কেন্দ্র করে শাহজাহানী মসজিদ, আকবরী মসজিদ, ওসমানিয়া মঈনীয়া মাদ্রাসা, জানানা খানা, নহবৎ খানা, আড়াই দিনের ঝোপড়া নামক ইলুতৎমিসের তৈরী মসজিদ, নাক্কারা খানা, বুলন্ধ দরওয়াজা, আউলিয়া মসজিদ, জান্নাতী দরজা, বাবে রহমত ও বাবে সানজার, বেগমী দালান- প্রভৃতি ঐতিহাসিক দালান সমূহই যিয়ারতকারীদের রূহানী খোরাক। খাজা বাবার মাজার শরীফের গম্বুজের কারুকার্য ও সৌকর্য দেখে আধ্যাত্মিকজনেরা ভাবের জগতে বিচরন করতে থাকেন। খাজা গরীব নওয়াজের দরবারে অজস্র মানুষের ঢল কিসের আলামত? আল্লাহ পাক বলেন-"যারা খাটি ঈমানদার ও নেক আমলকারী, তাঁদের জন্য দয়াল আল্লাহ মহব্বতের ব্যবস্থা করে দেন "- (সুরা মরিয়ম ১৬ পারা)। সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারে এসে মন্তব্য করেছিলেন-"একজন কবরবাসী অলি আটশত বৎসর যাবৎ মূলতঃ ভারতবাসীকে শাসন করে চলেছেন"।

আজমীর শহরটির পশ্চিম দিক অসংখ্য পাহাড়ে ঘেরা এবং আনা সাগর দ্বারা সুরক্ষিত। পুর্বদিকটি ক্রমশঃ সমতল ভূমি। বর্তমান জনসংখ্যা দুলাখের উর্দ্ধে। খাজা গরীব নওয়াজের উছিলায় শহরের বাসিন্দারা ব্যবসা বানিজ্য করে উন্নতি লাভ করছে এবং অসংখ্য ফকির মিছকিন লালিত পালিত হচ্ছে। ৫৩৭ হিজরীতে গরীব নওয়াজ সিজিসতানের সানজার এলাকায় জন্ম গ্রহন করে ৫৮৬ হিজরীতে আজমীর শরীফ আগমন করেন (১১৯০খৃঃ)। ৪৬ বৎসর আজমীর শরীফ অবস্থান করে ৬৩২ হিজরীর ৬ই রজব তারিখে ইনতিকাল করে খোদার সান্নিধ্যে চলে যান। বর্তমানে আজমীর শরীফ আধ্যাত্মিক চেতনার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত। এ বৎসর বিছমিল্লাহ উরস শরীফে এক কোটি লোকের সমাবেশ হয়েছিল বলে আকাশবাণী ঘোষণা করেছে। এখানে একটি কথা বলতে হয়।

টঙ্গীতে ত্রিশ লক্ষ মুসল্লীর (তাবলীগী) সমাবেশ হয় বলে তাবলীগীরা এর নাম দিয়েছে বিশ্ব এজতেমা এবং হজ্জের পরে নাকি দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ। (নাউজু বিল্লাহ)! এক কোটী লোকের সমাবেশ হওয়া সত্বেও আজমীর শরীফের ৬ দিনের সমাবেশকে বিশ্বএজতেমা বলা হচ্ছে না এবং আরাফাতের সমাবেশের সাথেও তুলনা করা হচ্ছে না। অথচ তাবলীগীরা বাসস সংবাদ সংস্থার কাছে হজ্জের পরে দ্বিতীয় বৃহতম সমাবেশ বলে টঙ্গীর বেদ্বীনী সমাবেশকে প্রচার করছে। হজ্জের সাথে অন্য কোন সমাবেশকে তুলনা করা সম্পুর্ণ বেদ্বীনী ও বেঈমানী কাজ। স্বপ্নেপ্রাপ্ত এই বেদ্বীনী তাবলিগী কর্মকান্ড থেকে আল্লাহ মুসলমানকে রক্ষা করুন। আমীন!

দিল্লী রওয়ানা

২০শে অক্টোবর সকাল ৮টায় দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হই। কেনাকাটা ও মালপত্র বেশী হওয়াতে দু গাড়ীতে ১৮ জন আরোহনকারী এবং মালামাল নেই। বাকী ৩ জনকে পৃথক বাসে পাঠাই। কাফেলা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তারা কিছুটা মনক্ষুন্ন হন। কিন্তু এছাড়া উপায় ছিল না। ইচ্ছা ছিল দিল্লী আসার পথে জয়পুর থামবো এবং লাল প্রাসাদ সমূহ দেখবো। রাজস্থানের রাজধানী, পুরানা রাজপুতনার কেন্দ্র এবং ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে গোটা ভারতে জয়পুরের হাঁকডাক আছে। তদুপরি আনবিক কেন্দ্র রাজস্থানে হওয়াতে এর গুরুত্বই আলাদা। কিন্তু ড্রাইভার নাঈম অত্যন্ত চালাক। সে এবং তার সঙ্গী ড্রাইভার পরামর্শ করে জয়পুরের বাহিরে দিয়ে অন্য এক রাস্তায় চলে আসে। এর কারণ জানতে চাইলে তারা বল্লো- অন্যরাজ্যে দিল্লীর গাড়ী গেলে রাজ্য টেক্স দিতে হয়। তাই তারা অন্য রাস্তায় টেক্স ফাকি দিয়ে চলে আসে। বুঝলাম- ফাঁকিবাজ দুনিয়ার সর্বত্রই বিদ্যমান। বিকাল ৪টা নাগাদ দিল্লী চুড়িওয়ালান গলিতে হোটেল সীমা লজে এসে পৌঁছলাম। ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ অক্টোবর সকাল ৯টা পর্য্যন্ত উক্ত হোটেলেই অবস্থান করলাম। এর মধ্যে ৪ জন (মিঃ হায়দার উজ জামান, মিসেস জামান, মিঃ লালু ও মিসেস লালু) বিশেষ ব্যবস্থায় টিকিট পাল্টিয়ে ২২ তারিখ কলকাতা হয়ে দেশে চলে আসেন। আমরা রয়ে গেলাম দিল্লী, পানিপথ ও বেরেলী শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে।

পানিপথ

ড্রাইভার নাঈমকে নিয়ে দুই গাড়ী করে ২১ জনের কাফেলা পরদিন ২১ তারিখ রওনা হলাম পানিপথের উদ্দেশ্যে। দিল্লী হতে ৯৯কিঃ মিঃ উত্তরে পাঞ্জাবের পথে হরিয়ানা রাজ্যে কর্ণাল জিলায় পানিপথ অবস্থিত। স্থানটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কেননা, এখানে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট বাবর ও দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহীম লোদীর মধ্যে ১ম পানিপথের যুদ্ধে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী নিহত হন এবং পানিপথেই

তাঁকে দাফন করা হয়। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল সম্রাট আকবর ও হিন্দুরাজা হিমুর মধ্যে। ফলাফল তো সবারই জানা। পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়েছিল ইরানের নাদির শাহ ও মারাঠা শক্তির মধ্যে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে। দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য তখন পতনোন্মুখ। দিল্লীর পতন ঠেকানোর জন্য নাদির শাহ মারাঠাদের বিরুদ্ধে পানিপথে যুদ্ধ করে দিল্লীর মসনদ কিছুদিনের জন্যে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হন এবং মুঘল দুর্বল সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সে সাথে লুন্ঠন করে নিয়ে যান- বিখ্যাত কুহিনূর ডায়মন্ড পাথর, ময়ুর সিংহাসন ও অজস্র রাষ্ট্রীয় ধন ভান্ডার। মারাঠাদের থেকে রক্ষা পেলেও দিল্লী দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। পানিপথের আরও কিছু উত্তরে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র অবস্থিত। হরিয়ানার গরু খুব বড় শিংওয়ালা ও উঁচু। কোরবাণীর সময় হরিয়ানা রাজ্য থেকেই বাংলাদেশে অধিকাংশ গরু আসে। হিন্দুরা গরু খেলে বাংলাদেশে গরুর অভাব দেখা দিত। তারা দেবতা জ্ঞানে গরু পালেও পুজা করে। আবার বিক্রিও করে দেয়। মুসলমানরা সেই দেবতা কিনে খেয়ে ফেলে। কি আশ্চর্য! একজনের দেবতা অন্য আর একজনের খাওয়ার বস্তু। দেবতা কি সত্যিই খাওয়ার বস্তু ? যাক-

পানিপথ ঐতিহাসিক স্থান। ঢাকা-লাহোর ট্রাঙ্করোডের পাশে পানিপথ মহকুমা শহর অবস্থিত। বর্তমান জনসংখ্যা দুই লাখ। তার মধ্যে একলাখ মুসলমান। এই পানিপথে অনেক বিখ্যাত লোকের বাসস্থান। হযরত শরফুদ্দীন বুআলী শাহ কলন্দর (রহঃ), হযরত খাজা সামছুদ্দিন তুর্কী পানিপথী (রহঃ), হযরত শেখ মখদুম জালালুদ্দীন কবিরুল আউলিয়া (রহঃ), কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী এবং মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী প্রমুখ বিখ্যাত মনিষীদের

মাযার ও কবর রয়েছে পানিপথে। তন্মধ্যে হযরত বুআলী শাহ কলন্দর (রহঃ)-এর যিয়ারতগাহ হিসাবেই পানিপথ বেশী প্রসিদ্ধ। বিদেশী মুসলমান পানি পথে বেশী যাতায়াত করেন আধ্যাত্মিক কারণে। জাগতিক কারণ একদিন বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষের গুরুত্বও হারিয়ে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক মহাপুরুষগণ চির অক্ষয় ও অমর এবং মানুষের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসনের অধিকারী হয়ে তারা ফয়েজ বিতরণ করতে থাকেন।

আমরা পানিপথে পৌছে গেলাম দেড় ঘন্টায়। মাযারের দূরে গাড়ী রেখে পাঁয়ে হেটে যেতে হলো। ঐতিহাসিক স্থান হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নের ছোঁয়া খুব কমই লেগেছে। কেননা এটা মুসলমান প্রধান এলাকা। মাজার এলাকায় প্রবেশ করে অজু করে মাগরিব নামাজ আদায় করলাম। তারপর যিয়ারত করার ব্যবস্থা হলো। মাযারের খাদেম- সৈয়দ এ, আহমদ সাহেব আমাদেরকে প্রথমে চা পান করালেন। তারপর যিয়ারত করতে গেলাম। হযরত শরফুদ্দিন বুআলী শাহ কলন্দর (রহঃ) খোদা প্রদত্ত ঐশি শক্তি সম্পন্ন ওলীগণের মধ্যে অন্যতম- আরবীতে যাকে রুহানী তাসাররুফ বলা হয়। তাঁর পিতা শেখ ফখরুদ্দীন ইরাকী (রহঃ) পানিপথে এসে বসবাস শুরু করেন। ৬০৬ হিজরীতে কুতুবুদ্দীন আইবেক-এর রাজত্ব কালে বু আলী কলন্দর পানিপথে জন্মগ্রহণ করেন এবং জাহেরী বাতেনী অনেক কামালিয়াত অর্জন করেন। হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী-(রহ)-এর খেদমতে থেকে তিনি ফয়েজ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সরাসরি স্বপ্নে হযরত আলী (রাঃ) এর ফয়েজ প্রাপ্ত হয়ে বু আলী কলন্দর মজজুব হয়ে যান। এজন্য তাঁর উপাধী হয় বু-আলী কলন্দর- অর্থাৎ হযরত আলী (কঃ)-এর খুশবু প্রাপ্ত কলন্দর। তিনি মস্ত- কলন্দর ফকির। তাঁর অসংখ্য কারামত দ্বারা তিনি পানিপথ এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ) এর সমসাময়ীক হওয়ার কারণে তাঁর প্রসিদ্ধি বেড়ে যায় এবং ভারতে ইসলাম প্রসারে তাঁর মূল্যবান অবদান স্বীকৃত হয়ে যায়।

হযরত বু-আলী শাহ কলন্দরের (রহঃ) ভক্ত ছিলেন মুবারক খান নামক এক শাহজাদা। সুলতান গিয়াস উদ্দীন খিলজীর শাহজাদা মোবারক খান বু-আলী শাহ-এর একান্ত ভক্ত হয়ে যান এবং তাঁর খেদমতে থাকা অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন। এজন্য প্রথমে মোবারক খান (রহঃ) এর মাযার যিয়ারত করে তারপর হযরত বু-আলী শাহ (রহঃ) এর যিয়ারত করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।

আমরা মাযারে প্রবেশ করে পূর্বমূখী দাঁড়িয়ে যিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করে মিলাদ শরীফ- "মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম" শুরু করতেই খাদেম সাহেব মাযারের একখানা পাগড়ী অধমের মাথায় পরিয়ে দেন। যিয়ারতকালীন সময়ে আমাদের সহযাত্রী ও অন্যান্য যিয়ারতকারীদের মধ্যে এক প্রকার হাল ও জজবা পয়দা হয়ে যায়- যা উপলব্ধি করা যায়- কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। হযরত

মোবারক খান (রহ) এর মাযার যিয়ারত করে বের হয়ে আসতেই দরজায় দেখলাম- কাউয়ালের দল সেই বিখ্যাত কাওয়ালী 'মস্ত কলন্দর' গজল খানা পরিবেশন করছে পাঞ্জাবী ভাষায়। যিয়ারত শেষ করে খাদেম সাহেব নিজ কামরায় সবাইকে নিয়ে গেলেন এবং প্রত্যেককে একখানা পাগড়ী পরিয়ে দিলেন এবং মহিলাদেরকে দিলেন একখানা ওড়না। যাক, ছালাম কালাম শেষ করে একজন গাইড নিয়ে চলে গেলাম তিন মিনিটের পথ পূর্ব দিকে দু'জন অলির মাযার যিয়ারত করতে। তাঁরা হলেন- হযরত সামছুদ্দিন তুর্ক সাবেরী (রহঃ) ও কবিরুল আউলিয়া হযরত শেখ জালালুদ্দীন (রহঃ)। পাশেই কাজী সানাউল্লাহ পানিপথীর পাকা কবর। কিন্তু যিয়ারতকারী নেই। কবর তালাবদ্ধ দেখলাম। কিন্তু পাশের মাযার দুখানা লোকে সরগরম। এখানেই কিছু তারতম্য লক্ষ্য করলাম। শত শত কিতাবের লেখক এবং তাফসীর লেখক হওয়া সত্বেও তাঁর এই অবস্থা! আর পাশের দু'জন আল্লাহর অলী হিসাবে পরিচিতি লাভ করার ফলাফলও চোখে দেখে আসলাম। বুঝতে পারলাম- শুধু শরীয়তের আলেম হওয়া যথেষ্ঠ নয়। তার সাথে তরিকতও থাকতে হবে। তাহলেই পূর্ণতা অর্জিত হয় এবং সৃষ্টির আশ্রয়স্থল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। যিয়ারত শেষে রাত্রের খানা খেলাম বু আলী কলন্দর মাযার সংলগ্ন হোটেলে। ভাত নয়- মনে হলো- কঙ্কর মিশ্রিত অর্ধসিদ্ধ কিছু চাউল। যাক, দিল্লীতে এসে সিমা লজে রাত্রি যাপন করলাম। পরদিন ২২ অক্টোবর দিল্লী মাযার সমূহের যিয়ারত করার প্রোগ্রাম।

দিল্লীর মাযার সমূহের যিয়ারত

২২শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার সকাল বেলা লালকিল্লার মোড়ে গিয়ে যিয়ারতের রিজার্ভ বাসে উঠলাম। মাথা পিছু ৫০ রূপী ভাড়া। কিল্লার মোড়ে দেখলাম- বিশাল ক্যাম্প তৈরী করা হয়েছে আজমীর শরীফ গমনকারীদের জন্য। ক্যাম্প ও রাস্তার উপরে কয়েক মাইল পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ এবং শত শত বাস ও যানবাহন। খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) এর উরস মোবারকে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতের পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের সমস্ত যাত্রী দিল্লী এসে আজমীর গমন করে থাকেন। তাই তাদের অভ্যর্থনার জন্য এই বিশাল ক্যাম্প তৈরী করা হয়েছে।

যাক, ভাড়া করা রিজার্ভ বাসে চড়ে প্রথমেই গেলাম মিতরা রোডে অবস্থিত হযরত রহিমউদ্দিন ইরাকী- খলিফা হযরত আবু বকর তুসী- ওরফে মটকে শাহ (রহঃ) ও হায়দারী কলন্দরীর (রহঃ) মাযার যিয়ারতে। টিলার উপর অবস্থিত মাযার শরীফে অসংখ্য যিযারতকারীর ভীড়। রোডের উপর অসংখ্য মটকা। লোকেরা এক একটি মটকা খরিদ করে মাযারের চতুস্পার্শে বৃক্ষের ডালে ডালে গেঁথে দিচ্ছেন। এতেই মনোবাসনা পূর্ণ হয়। এগুলো এক এক অলীর ভিন্ন ভিন্ন কারামত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যিয়ারত শেষ করে বাসে উঠে বসলাম।

এবার গেলাম হযরত নাসির উদ্দিন মাহমুদ রৌশন চেরাগ দেহলী (রহঃ) এর মাযার যিয়ারতে। বিরাট সমতল চত্বরে তাঁর পবিত্র মাযার। তিনি হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) খলিফা। সেখানে যোহরের নামায আদায় করে যিয়ারত করলাম এবং মিলাদ ও কিয়াম করলাম। শত শত লোক আমাদের মিলাদ মাহফিলে যোগ দিলেন। দোয়া মুনাজাতের পর পূনঃ বাসে উঠলাম। এবার গেলাম হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) ও হযরত আমির খসরু

(রহঃ)-এর মাযার যিয়ারতে। বস্তি নিযামুদ্দীন এলাকায় অবস্থিত মাযার দ্বয় যিয়ারত করতে বড় বেগ পেতে হলো। হাজার হাজার যিয়ারতকারীর ভীড় সামাল দিতে খাদেমগণ শেষ পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। ফুল ও আতর-গোলাপ ছিটিয়ে যিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করে মুনাজাত করে চলে এলাম এবং গলির শেষ মাথায় এসে মাছ দিয়ে বাঙ্গালী খানা খেলাম মাত্র ১২ রূপীতে। খুবই তৃপ্ত হলাম। হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার পাশেই রয়েছে তাবলীগ জামাতের হেড অফিস। তারা যিয়ারতকারীদের বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারেনা। তারা নিম্নস্বরে বলে- কবর পুজা করতে যেয়োনা। তাবলীগীরা মাযার ও যিয়ারত বিরোধী দল এবং পীর ফকিরীতে অবিশ্বাসী ফের্কা। দেওবন্দ সম্প্রদায়েরই একটি নতুন রূপ এই তাবলীগ জামাত। এরা মুলে ওহাবী এবং মিলাদ ও কেয়াম বিরোধী দল।

সেখান থেকে বাসে উঠে গেলাম মেহেরওলী নামক এলাকায়। এটাই দিল্লীর প্রথম রাজধানী। এখানেই রয়েছে কুতুব মিনার, কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ, কুতুব উদ্দিন আইবেক-এর কবর ও রাজ প্রাসাদ এবং সুলতান ইলতুতমিস-এর

মাযার। এখানেই চিরস্থায়ী নিদ্রায় শুয়ে আছেন খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ)-এর প্রধান খলিফা হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহঃ)। ইনি গায়েবী (জান্নাতী) কেক এনে মেহমানদারী করতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহন করতেন বলে তাঁকে কাকী (রহঃ) বলা হয়। চিশতিয়া তরিকার প্রচার- প্রসার এখান থেকেই হয়েছে। তাঁর ওস্তাদ হযরত হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহঃ) এর পবিত্র মাযার একটু উঁচু টিলার উপর। হযরত হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহঃ) ছিলেন শেখ সোহরাওয়ার্দী (রহঃ)-এর প্রধান খলিফা। ইনার ছেলের কাছে বিবাহ হয়েছিল খাজা গরীব নওয়াজের সাহেবজাদী হাফেজা জামালের। বিরাট এলাকা জুড়ে মাযার এলাকা। মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফির খানা ইত্যাদির সুব্যবস্থা রয়েছে এখানে। আমরা হযরত বখতিয়ার কাকী (রহঃ) এর যিয়ারত করতে গেলাম। প্রশস্ত খোলা জায়গায় উম্মুক্ত পাকা মাযার শরীফ এবং উপরে রয়েছে বিশাল গম্বুজ। কিন্তু চারদিকে দেওয়াল নেই। প্রাণ ভরে যিয়ারত করে মিলাদ শরীফ পড়লাম। শত শত যিয়ারতকারী থমকে দাঁড়িয়ে গেল মিলাদ শরীফে। হযরতের শানেও কিছু কাসিদার মাধ্যমে মিলাদ শরীফ সমাপ্ত করে আবেগভরা হৃদয়ে হাত উঠালাম মাওলার দরবারে। লোকদের মধ্যে আহাজারী ও কান্নার রোল পড়ে গেলো। ভাবের জগতে কতক্ষণ মুনাজাতে ছিলাম- জানিনা। খাদেমগণের তাকিদ বানী শুনে সংক্ষিপ্ত করতে হলো মুনাজাত। সত্যিই এই দরবার কুতুবেরই দরবার। যাঁর দিকে তাকালে হেদায়াতের সার্বিক দিক নির্ণয় করা যায়- তিনিই কুতুব। তিনিই আকাশের ধ্রুব তারা সদৃশ। এরপর হযরত ওস্তাদ হামিদ উদ্দীন নাগোরী (রহঃ) এর মাযার যিয়ারত করে নেমে আসলাম নীচে। বাস স্ট্যান্ড। শত শত বাস দাঁড়িয়ে আছে নিজ নিজ যাত্রীদের প্রতীক্ষায়। আমরা বাসে চড়ে পুরান দিল্লীর দিকে রওনা হলাম। পথিমধ্যে যাত্রীদের অনুরোধে ড্রাইভার বাস থামালো ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাযজ্ঞ স্থানে। এর পর ন্যাশনাল পার্ক হয়ে গাড়ী দিল্লী লালকিল্লার মোড়ে এসে থামলো। আমরা সিমা লজ হোটেলে চলে এলাম। পরদিন প্রোগ্রাম করলাম বেরেলী শরীফ যিয়ারত করার। এটাই শেষ যিয়ারত।

বেরেলী শরীফ যিয়ারত

২৩শে অক্টোবর শুক্রবার দুটি টাটা সমু মাইক্রোবাস ভাড়া করে ১৭জনের কাফেলা রওনা হলাম দিল্লী হতে পূর্বদিকে ইউ, পি বেরেলী শরীফে। দূরত্ব ২৫৭ কিঃ মিঃ। ভাড়া দিলাম দু'গাড়ীতে ৫০০০/= রূপী। সকালে রওনা দিয়ে জুমা ধরলাম বেরেলী শরীফের আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) এর মসজিদে। আমাদের সাথী মহিলারা বর্তমান গদীন শীন হযরত আখতার রেযা খান ওরফে আজহারী মিয়ার অন্দর মহলে চলে গেলেন। আলা হযরতের মসজিদে জুমা হয় বেলা ২টার সময়। এ ফাঁকে প্রথম যিয়ারত করলাম আলা হযরতের মাযার শরীফ। ফুল আর ফুলে ছেয়ে গেছে ৫ জনের মাযার শরীফ। ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ), হুজজাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা হামেদ রেযা খান (রহঃ), মুফতিয়ে আযম হিন্দ হযরত মোস্তফা রেযা খান (রহঃ), নাতি হযরতুল আল্লামা ইবরাহীম রেযা খান (রহঃ)

পুঁতি হযরত রায়হান রেযা খান (রহঃ)- এই পঞ্চ রত্নের মাযার যিয়ারত করে ভাগ্যবান হলাম। সেখানে এলেমের স্বাদ পাওয়া যায়। জুমা শেষে খানা খেলাম মেহমান খানায়। বিদেশী মেহমানদের জন্য অবারিত লঙ্গরখানা- সাদাসিদা খানা। অথচ অমিয় স্বাদ। আছরের পূর্বেই বর্তমান গদীনশীন হযরতুল আল্লামা আখতার রেযা খান ওরফে আজহারী মিয়ার (মাঃজিঃআঃ) সাথে বিদায়ী মোলাকাত করলাম এবং আহলে সুন্নাতের প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) কনফারেন্স ও সুন্নী মহাসম্মেলনে তশরীফ আনার জন্য দাওয়াত করলাম। তিনি সানন্দে দাওয়াত কবুল করলেন এবং বললেন- "বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যাতায়াত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যদি পরিবেশ সুস্থ ও অনুকূল থাকে, তাহলে অবশ্যই যাবো।"

দোকান ও লাইব্রেরী থেকে যার যার ইচ্ছা মোতাবেক ওয়াজের ক্যাসেট, আলা হযরতের কারামতি আংটি ও কিতাব পত্র খরিদ করে বিদায়ী যিয়ারতের জন্য মাযার শরীফে গমন করলাম। মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে পর্দার সাথে যিয়ারতের ব্যবস্থা আছে। সেখানে শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দী করা হয়।

সেখানে প্রাণীর ফটো তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাদ্যযন্ত্রের সাথে সামা বা কাওয়ালী সেখানে হারাম। অথচ আমাদের দেশের রিজভী খেতাবধারী ও আলা হযরতের অনুসারী হওয়ার দাবীদার কোন কোন আলেম গানবাদ্য জায়েয বলে ফতোয়া দিচ্ছেন। এটা আলা হযরতের উপর মস্তবড় জুলুম ও তোহমত। বাদ্যযন্ত্র সম্পূর্ণ হারাম বলে আলা হযরত (রহঃ) আহকামে শরীয়ত গ্রন্থে দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তাই রিজভী সাহেবদের অনুরোধ করবো- শরীয়ত অনুসরণ করুন- নতুবা রিজভী নাম বর্জন করুন। এর উপরে বলার আর কিছু নেই।

যাক- শেষবারের মত বিদায়ী সালাম ও ফাতেহা আরজ করতে গিয়ে মিলাদ শরীফ শুরু করলাম আলা হযরতের বিখ্যাত কাসিদা "মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম" দিয়ে। আমাদের বাঙ্গালীদের মুখে উক্ত কাসিদা শুনে হিন্দুস্তানীরা থ' খেয়ে গেলেন এবং ভাবের আতিশয্যে কেঁদে ফেললেন। আমরাও সে কান্নায় শরীক হলাম। প্রাণভরে দোয়া চাইলাম আহলে সুন্নাতের উন্নতির জন্য, বাংলাদেশের ওহাবী তাবলীগী সয়লাবের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম থেকে ঈমান বাঁচানোর জন্য। এই সেই সিংহ পুরুষ- যিনি ওহাবী, কাদিয়ানী ও শিয়াদের বিরুদ্ধে কলমী জেহাদ করেছেন এবং নবী করিম (দঃ) এর শানে পনর শত কিতাব রচনা করেছেন। তিনি না হলে দিল্লীর ইসমাইল দেহলবী, দেওবন্দের কাশেম নানুতবী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, আশ্রাফ আলী থানবী ও খলীল আহমদ আম্বেটির লিখিত কুফরী আক্বিদা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। তিনিই উক্ত পঞ্চ পান্ডবের কুফরী আকিদাগুলো উদঘাটিত করে মক্কা ও মদিনা শরীফের ৩৩ জন মুফতীর নিকট পেশ করেন এবং তারা যাচাই বাছাই করে উক্ত ৫ জনের বিরুদ্ধে ১৩২৪ হিজরীতে কুফরী ফতোয়া জারি করেন। যার নাম "হোসসামুল হারামাঈন"। বর্তমানে এর বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে। উক্ত কিতাব শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ এবং চট্টগ্রাম আন্দর কিল্লায় পাওয়া যায়। বেরেলী পুরান রেল স্টেশনে গাড়ী রেখে রিক্সাযোগে মহল্লা সওদাগরা আলা হযরতের বাড়ী ও মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম। সেই সরুগলি দিয়ে পুনরায় রিক্সাযোগে পুরান রেল স্টেশনে এসে মাইক্রোতে উঠি এবং বিকাল ৫টায় দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সিমা লজ হোটেলে রাত ১২টায় পৌঁছে রাত্রি যাপন করি। পরদিন ২৪শে অক্টোবর ১১টায় হাওড়া স্পেশাল লোকাল ট্রেনযোগে হাওড়ায় রওনার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে থাকি।

দিল্লী জংশনে ভোগান্তি

মালপত্র বাধাছাদা করে সকাল ৯টায় হোটেলের হিসাব চুকিয়ে রিক্সা করে দিল্লী স্টেশনে পৌঁছলাম। সিডিউল অনুযায়ী গাড়ী ৮নং প্লাট ফরমে থাকার কথা।

সে অনুযায়ী যথাসময়ে ৮নং প্লাট ফরমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। বসার জায়গা পাইনি- তাই কষ্ট হচ্ছিল। তবুও ফাঁকে ফোকরে অন্যের টেবিলে কিছুক্ষণ বসে পা সোজা করার চেষ্টা করেছি। জম্মু তাইওয়া ট্রেনটি পাঞ্জাব হয়ে দিল্লী এসে হাওড়া স্পেশাল নামে হাওড়া আসার কথা। সেদিন গাড়ী আসতে বিলম্ব হলো ৪ঘন্টা- অর্থাৎ বিকাল ৩টায় গাড়ী এসে পৌঁছল দিল্লী জংশনে। কিন্তু হঠাৎ করে মাইকে ঘোষণা হলো ৮নং প্লাট ফরমের পরিবর্তে ৫ নম্বরে গাড়ী আসবে। তাই বিপদে পড়লাম। কুলির রেইট ৫০রুপী- তাও পাওয়া যায় না। মানুষের হুড়াহুড়ি আর নিজস্ব মালের বোঝা নিয়ে সেদিন উপলব্ধি করলাম- হাশরের ময়দানের অবস্থা। সেদিন সকলে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। কেউ কারো কষ্ট লাঘব করবেনা এবং অন্যের গুণাহের বোঝাও কেউ বহন করবেনা। ঘর্মাক্ত হয়ে নিজ নিজ মাল নিয়ে পুলের উপর উঠে ৫নম্বরে গিয়ে গাড়ীতে সিট খুঁজে নিতে যে কষ্ট পেয়েছি- তা মনে থাকবে অনেক দিন। এত বেদনার মধ্যেও একটি আনন্দ ছিল- যাক দেশে ফিরছি, সন্তানাদি ও আপনজনদের কাছে যাচ্ছি। আসলে- যে বেদনার মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে বেদনাই মানুষ হাসিমুখে বরণ করে নেয়। তা'নাহলে সৃষ্টির বেদনা কেউ মেনে নিতনা। নারীরা সৃষ্টি সুখের উল্লাসেই সব বেদনা হাসিমুখে বরণ করে নেয়।

এবার ট্রেনের গতিপথ একটু ভিন্ন। ১০০ কিঃমিঃ কম- অর্থাৎ আলীগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, শোন নদী, মোঘল সরাই এসে গয়া কাশি হয়ে বর্ধমান হাওড়া। এতে দূরত্ব ১০০ কিঃমিঃ কমে ১৪৪১ কিঃমিঃ হয়ে যায়। এ দূরত্ব অতিক্রম করতে লেগেছে ৩৩ ঘন্টা। অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর বিকাল তিনটা থেকে ২৫শে অক্টোবর রাত বারটা পর্যন্ত। পথে বর্ধমান এসে গাড়ী থেমে গেল। আর চলেনা। কি হলো! পরে ঘোষণা হল- কলকাতা হাওড়া সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বন্দ চলছে। গাড়ী-ঘোড়া-ট্রেন সব বন্ধ। ২ ঘন্টা পর বন্দ সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। পরের দিন ২৬শে অক্টোবর খবরের কাগজে দেখলাম- মমতা ব্যানার্জি পুলিশের হাতে লাঞ্ছিতা হয়েছেন। তাই কংগ্রেস (সিপিএম) এই বন্দ ডেকেছিল। ২৫ তারিখ রাত ১২টার দিকে হাওড়া স্টেশনে প্রায় একই সাথে ৪টি ডাউন ট্রেন এসে পৌঁছলো। এত বড় জংশন ও স্টেশন। তা সত্ত্বেও তিল ধারণের জায়গা নেই। দুটি ঠেলাগাড়ি ভাড়া করে সবার মালামাল তুলে গেইট পার হয়ে রোডে এসে দেখি- টেক্সি মিটারে লাইনে আসছে- আর প্যাসেঞ্জার নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জারগণ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এমতাবস্থায় আমাদের ১৭জনের কাফেলার পক্ষে মালামাল নিয়ে লাইনে দাঁড়ানো অসম্ভব ব্যাপার। তাই ইকবাল ও বিপ্লব- দুজন জোয়ানকে পাঠালাম দূর হতে ৪টি টেক্সী ভাড়া করে নিয়ে আসতে। তারা নিয়ে আসলো সত্য-কিন্তু টেক্সীওয়ালা গাড়ী না থামিয়ে চলন্ত অবস্থায় আমাদেরকে উঠতে বললো। কি করা যায়। কোন রকমে পৃথক

পৃথকভাবে টেক্সিতে উঠলাম। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। ড্রাইভার বললো- দালালরা লাইনের টেক্সী ছাড়া অন্য কোন টেক্সী ঢুকতে দেয়না। তাই তারা চুরি করে আমাদেরকে উঠিয়ে নিচ্ছে। দাঁড়াতে পারবেনা। যাক, আগের কথামত কলকাতা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের কুলীন লেইনস্থ আমরীন লজে আসার কথা। তাই- যে যেভাবে পারছে সেখানে এসে রাত ২টার দিকে একত্রিত হলাম। কোন রকমে হোটেল মালিক থাকার ব্যবস্থা করলেন ১২সিটে ১৭জন। কিন্তু ভাড়া ঠিকই নিলেন ১৭ জনের। দেখলাম- কলকাতা ও দিল্লীর মহাজনরা পুরোপুরি ব্যবসায়ী। বাংলাদেশে অন্ততঃ এরূপ নিষ্ঠুরতা খুবই কম। পরদিন ২৬ অক্টোবর বেলা ১২টায় বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করলাম।

হরিদাসপুর-বেনাপোল বর্ডারের অত্যাচার

২৬শে অক্টোবর বেলা ১২টায় রওনা হয়ে তিনটি টেক্সী করে ১৮০০রূপীতে হরিদাসপুর এসে পৌঁছলাম এবং হিন্দুস্তানী কারেন্সী ১১১ টাকা হারে বদলিয়ে নিলাম। চেকপোস্টে অনেক রকমের দালাল থাকে। ইমিগ্রেশনে গিয়ে পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন ফরম জমা দিলাম। এক অফিসার নর্মাল রেইটে পাসপোর্ট চেক করে ছেড়ে দেবে- এমন সময় আর এক অফিসার এসে সব পাসপোর্ট নিয়ে গেল এবং মাথাপিছু ২০০ রূপী দাবী করে বসলো। সে হয়রানী মূলক আচরণ শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত ১৭ জন ১৭০০ রূপীতে ছাড়া পেলাম। অভিযোগ কার কাছে করবো? কি প্রমাণই বা থাকে এতে? ইমিগ্রেশন শেষে আসলাম কাস্টম অফিসে। নিয়ম মাফিক পাসপোর্ট জমা দিয়ে বসে আছি। এখানে দাবী করলো ২০০ রুপী মাথা পিছু। কত বললাম- আমরা অবৈধ কোন মাল আনিনি। ইচ্ছা হলে দেখতে পারেন। কিন্তু তাদের যে টাকার প্রয়োজন। কি আর করা যায়। তাদের দাবী মিটিয়ে রেহাই পেলাম। এই হলো ভারতীয় বর্ডারের অত্যাচারের সামান্য চিত্র। প্রতিনিয়ত কত যে পর্যটক তাদের হাতে নাজেহাল হচ্ছে- তা নির্নয় করা কঠিন। ভারতীয় দূতাবাস তো বাংলাদেশীদেরকে মনে করে তাদের জমিদারীর প্রজা। এসব অনিয়ম ও হয়রানীর অবসান হতে পারে উভয় সরকারের কড়াকড়ি ও সদিচ্ছার উপর। মাগরিবের সময় বেনাপোল চেকপোস্ট, কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশন চেকআপ শেষ করে সোহাগ পরিবহনে এসে ঢাকার টিকিট কেটে নেই। রাত ৮-৩০ মিনিটে রওনা দিয়ে ২৭শে অক্টোবর সকাল ৭টায় ঢাকায় পৌঁছে যার যার গন্তব্যস্থলে চলে যাই। এভাবে আমাদের ১৭ দিনের আজমীর সফরের সমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু মনের পর্দায় অঙ্কিত হয়ে রইলো অজস্র স্মৃতি ও তিক্ত অভিজ্ঞতা। দুনিয়া নির্ভেজাল নয়। জান্নাত ও জাহান্নাম এখানে পাশাপাশিই অবস্থান করছে। এর মধ্য দিয়েই পথ বেছে চলতে হবে। আল্লাহ

পাক আমাদেরকে পুনরায় নিরপোদ্রব পথে আজমীর ও পূন্যময় মাযার সমূহে যাবার সুযোগ করে দিন- আমিন!

উপসংহার ও মন্তব্য

আমরা- যিয়ারত কাফেলা আজমীর শরীফ ও অন্যান্য মাযার শরীফ যিয়ারত করে প্রায় ছয় হাজার কিলোমিটার পথ ভ্রমণ করে এলাম। আর পিছনে রেখে আসলাম অনেক পূন্য স্মৃতি। মনে পড়ে- হযরত সুলতান বায়েজিদ বোসতামী(রহঃ) ও খাজা গরীব নাওয়াজ (রহঃ)-এর দীর্ঘ সফরের কথা। তাঁরা সফর করেছেন অলীদের দরবারে ও মাযারে মাযারে। কিসের সন্ধানে ? যাঁর সন্ধানে তাঁরা দীর্ঘ পথ সফর করেছিলেন- তাঁকেই পেয়েছেন এবং তাঁদের উছিলায়ই পরবর্তীতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাচ্ছেন। তাঁরা হচ্ছেন হেদায়াত ও খোদার রহমতের কেন্দ্রস্থল এবং মুসলিম ঐক্যের মিলন কেন্দ্র। এসব অলী আউলিয়ার মাযার আছে বলেই ইসলাম এখনও ঐসব জায়গায় গৌরবের সাথে টিকে আছে। খানায়ে কাবা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মৃতি নিদর্শন হিসাবে টিকে ছিল বলেই মক্কা শরীফ পূনরুদ্ধার হয়েছে। অলী আউলিয়াদের মাযার সমূহ সংরক্ষণ করার মধ্যে ইসলামের বিরাট স্বার্থ জড়িত রয়েছে। আল্লাহর নিদর্শন বলতে পবিত্র কোরআনে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক মাযার ও স্থান সমূহকেই বুঝান হয়েছে। যেমন, মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে নবী ও অলীগণের স্মৃতি স্থান সমূহ, মীনা, মোজদালেফা, সাফা ও মারওয়া পাহাড়, হেরা ও গারে সওর (তাফসীরে রূহুল বায়ান ও তাফসীরে নাঈমী)। এগুলো হচ্ছে খোদায়ী স্মৃতি চিহ্ন।

আজমীর শরীফ সহ পবিত্র মাযার সমূহ যিয়ারত করে আমরা কি পেয়েছি- তা সঠিক বলতে পারবনা। তবে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ধন্য হয়েছি- একথা বলা যাবে। আতরের দোকানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে সুগন্ধি গায়ে লাগবেই। তদ্রূপ- ওলীদের সোহবতে কিছুক্ষণ অবস্থান করার মধ্যেও রয়েছে অসীম ফয়েজ ও নেয়ামত। মাওলানা রুমী ও শেখ সা'দী (রহঃ)-এর অমর গ্রন্থে এসবের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নবী এবং অলীগণ জীবিত অবস্থায় যেমন নবী ও অলী, তেমনিভাবে ইনতিকালের পরেও নবী ও অলীই থাকেন। নবীগণের মোজেযা এবং অলীগণের কারামত ইনতিকালের পরেও সমানভাবে বিদ্যমান

থাকে। ইহাই ইসলামী আকায়েদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকত লাভের জন্য আল্লাহ পাক সকলকে তৌফিক দিন ও সঠিক হেদায়াত নসীব করুন। আমিন।

বিহুরমাতে সাইয়িদিল মোরসালীন ওয়াল আউলিয়াইল কামিলীন!

সমাপ্ত

অনুমতি ঃ

অনুমোদন সাপেক্ষে আমার লিখিত যে কোন গ্রন্থ আমার স্বনামে অবিকল হুবহু ছাপিয়ে লিল্লাহ প্রচার করার জন্য বিশেষ অনুমতি দেয়া হলো। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ।

স্বাক্ষর-
অধ্যক্ষ হাফেজ এমএ জলিল
১৫ই মার্চ '৯৯ইং